মুক্তি-আন্দোলনে অভেদানন্দ

(১৮৯৬-১৯০৬)

বংগীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক,
'মহাভারতের ক্ষত্রিয়গণ কি অনার্য?'
'অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা'
প্রণেতা

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

ও

'ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়'
'বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী'
'বিনয় সরকারের বৈঠকে'
প্রণেতা

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাতীর্থ কার্যালয়
৪০।১, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

মূল্য : এক টাকা

১৯৪৬

প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক
কালিদাস মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাতীর্থ
কার্যালয়ের পক্ষে, ৪০।১ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪ থেকে

একমাত্র পরিবেশক
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস,
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি, এল. রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঐতিহাসিক

ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

চীনাশাস্ত্রী

ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর

করকমলে-

সূচীপত্র

লেখকদের বিবৃতি

(ক)

স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯) নব্যভারত গঠনের অন্যতম প্রধান অধিনায়ক। ভারতবাসীর পাশ্চাত্য বিজয়ের তিনি নিঃসন্দেহে একজন প্রথমশ্রেণীর বরেণ্য সেনাপতি। বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) আরদ্ধ আন্দোলনকে ইয়োরোমেরিকায় বাড়িয়ে তোলেন অভেদানন্দ, তাকে শক্তিশালী ও সার্থক করে তোলেন অভেদানন্দ। ইতিহাসই তার প্রমাণ।

বিবেকানন্দ-আন্দোলন বস্তুত বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ'র সৃষ্টি। ইয়োরোমেরিকায় ভারতবাসীর দিগ্বিজয়ের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যাঁরা অভেদানন্দকে বাদ দেন বা উপেক্ষা করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে বস্তু-নিষ্ঠার অভাব সাংঘাতিক। পাশ্চাত্যে পরিচালিত বিবেকানন্দ আন্দোলনে অভেদানন্দে'র দান এতই বেশী যে অভেদানন্দকে বাদ দিয়ে সে-আন্দোলনের জন্মকথা কল্পনা করাও কঠিন। এমন কি, কোনো কোনো পণ্ডিতের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ'র চেয়েও অভেদানন্দ'র কৃতিত্ব বেশী। মার্কিণ মনীষী ডক্টর ওয়েণ্ডেল্ টমাস এ রকম অভিমত পোষণ করেন। তাঁর "হিন্দুইজম্ ইন্‌ভেড্‌স্ আমেরিকা" (নিউইয়র্ক, ১৯৩০) গ্রন্থে এ অভিমতের উল্লেখ দেখ্‌তে পাই। উক্ত গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "ঐতিহাসিক পটভূমি ও কর্মক্ষেত্রের দিকে আরও বেশী দৃষ্টি রাখার ফলে বিবেকানন্দ'র চেয়েও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংগে বেদান্তের সামঞ্জস্য বিধান করতে অভেদানন্দ সক্ষম হয়েছিলেন বেশী।" মতটা হয়তো চরম। তবে এ ধরণের উক্তির দ্বারা এটুকু নিঃসন্দেহে সূচিত হয় যে, পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ-আন্দোলনে ও বিংশ

শতাব্দীর বৃহত্তর ভারতের গোড়াপত্তনে (১৮৯৩-১৯০২) অভেদানন্দ বিশেষ গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ সমাজ-বিপ্লবের নানা আবর্ত-সংঘাতের ফলে এতবড় একজন বিরাট কর্মবীরের কথা আমাদের অনেকের কাছেই এ-যুগে তেমন সুস্পষ্ট নয়। অনেকের অভিমতে যে-প্রবাস অভেদানন্দকে স্বনামধন্য ও ইতিহাসে অমর করেছে, সে-প্রবাসই আবার ভারতীয় জনসাধারণের কাছে তাঁকে বিস্মৃত হবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিমতটা আংশিক সত্য। বিস্মৃতির মূল কারণ সন্ধান করতে হবে সমাজের বৈচিত্র্যময় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে। সে অনুসন্ধান বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বস্তু "মুক্তি-আন্দোলনে অভেদানন্দ"। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম বৎসররূপে ১৮৮৫ সনের যদি উল্লেখ করা হয়, তবে বিদেশে ভারত প্রচারের জন্মসন হিসাবে ১৮৯৩ সনকে স্মরণ করা যেতে পারে। সত্যিকথা বলতে গেলে ১৮৯৩ সন থেকেই ইয়োরোমেরিকায় ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রচার সুরু হয়। অভেদানন্দ সেই আন্দোলন-পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত। অবশ্য ১৯০৬ এর পর আরও ১৫ বৎসর অর্থাৎ ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পাশ্চাত্যে ভারতের স্বপক্ষে বৈদেশিক প্রচারকার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম দশ বৎসরই (১৮৯৬-১৯০৬) সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও ঘটনাবহুল। এই দশকে বৈদেশিক প্রচারের দিক থেকে ইয়োরোমেরিকায় যথার্থ ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে অভেদানন্দ প্রায় অদ্বিতীয়। "মুক্তি-আন্দোলনে অভেদানন্দ" অধ্যায়ে সেই কার্যাবলীর জরিপ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টির লেখক কালিদাস মুখোপাধ্যায়। পূজা সংখ্যা, ১৯৪৭ সালের 'বিশ্ববানী'তে রচনাটি প্রথম প্রকাশিত।

"বংগবিপ্লবে অভেদানন্দ" অধ্যায়টির লেখক হরিদাস মুখোপাধ্যায়। বংগবিপ্লবের যুগে (১৯০৫-০৬) অভেদানন্দ'র চিন্তাধারা বা দর্শন ছিল কী, এ দর্শনের প্রকৃতিই বা কী, তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে এখানে। সে বিশ্লেষণে অভেদানন্দকে বিপ্লব-সাধক হিসাবে পাওয়া যায়। রচনাটি ১৯৪৭ সনের 'বিশ্ববাণী'তে আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়টির নামকরণ হয়েছে "সমসাময়িক ভারতের চোখে অভেদানন্দ" (১৯৪১-৪২)। এতে বিনয় সরকার, সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, রাধাকৃষ্ণান্, তান্ ইয়ান্ সান্, রাধাকুমুদ মুখার্জী প্রমুখ সমসাময়িক জননায়কদের অভেদানন্দ বিষয়ে পত্রাবলী বা আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। আলোচনা ও পত্রাবলীর সবগুলিই হরিদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৯৪১-৪২ সনে সংগৃহীত হয়েছিল। ১৯০৫-৬ সনের ভারতবাসী অভেদানন্দকে কি চোখে দেখ্‌তো তার মস্তবড় দলিল হলো অভেদানন্দ'র 'লেক্‌চারস্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া", (১৯০৬) বইখানি। আজ বিংশশতাব্দীর পঞ্চম দশকে দেশের জননায়কগণ অভেদানন্দকে কি চোখে দেখ্‌ছেন, তার একটুমাত্র পরিচয় এখানে ধরে রাখা হয়েছে। হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "নবযুগের মানুষ"। (১৯৪১) গ্রন্থে এ ধরণের আরও অনেকগুলি চিঠিপত্র সন্নিবেশিত আছে।

(খ)

বর্তমান গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা এসেছে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সভাপতি স্বামী সদাত্মানন্দে'র কাছ থেকে। তার কাছে আমাদের ঋণ স্বভাবতই অপরিশোধেয়। এই প্রসংগে 'শ্রীদুর্গা'-প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ'র নামও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থপ্রকাশের বিভিন্ন স্তরে

তিনি আমাদের কাজ নানাভাবে সহজ করে তুলেছেন। মুদ্রণ ব্যাপারে সাহচর্য পেয়েছি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অমর চৈতন্য ও "প্রভাত"-পত্রিকার সম্পাদক প্রমথনাথ পালের কাছ থেকে। এঁদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী।

বইয়ের নামকরণ ও প্রুফ্ দেখার সমস্যায় লেখিকা উমা সেনের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে বিশেষ সাহচর্য পেয়েছি অঞ্জলি সেনগুপ্তা ও রণজিৎ আচার্যর কাছ থেকে। তাছাড়া, অন্যান্য দিক থেকে যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে কমলেশ ব্যানার্জী ও পুরুষোত্তম ব্যানার্জী, উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, সুবোধ মজুমদার, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্র নাথ সান্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের কাছেই জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, অধ্যাপক বিনয় সরকারের নামোল্লেখ না করে পারছি নে। তিনি বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। ভূমিকায় তিনি বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ'র আন্দোলনের উপর নূতনভাবে আলোক সম্পাত করেছেন। তাঁর সহযোগিতা পেয়েছি বলে আমরা গৌরবান্বিত।

শিক্ষাতীর্থ কার্যালয়,
৪০।১ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

কালিদাস মুখোপাধ্যায়
ও
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

দেশী-বিদেশী কর্মবীরদের কথা এ কালের যুবক বাংলায় বেশ-কিছু পছন্দ-সই। বাঙালীর বাচ্চারা মানুষ হইতে শিখিতেছে। বিনোদ চক্রবর্তীর হাতে বাহির হইয়াছে "লিওনিদাশ্" (গ্রীক) "রেগুলাস" (রোমান) "লিঙ্কল্‌ন্" (মার্কিন) "গারফীল্ড', (মার্কিন) "আশুতোষ" ও "ফ্রীডরিস্ লিষ্ট" (জার্ম্মান)। রাধেশ রায় লিখিয়াছেন "যন্ত্র যুগের নেপোলিয়ন হেন্‌রী ফোর্ড"। দিলীপ মালাকারের হাতে পাইয়াছি "হার্ডার" (জার্ম্মান) আর "পেরোঁ" (আর্জেন্টিনিয়ান)। জাপানী "হিদেয়োশী" আসিয়াছে শিশির ভট্টাচার্যের আগ্রহে। সত্যেন মজুমদারের "স্তালিন" একালেরই চিজ্। তাঁহার "বিবেকানন্দ" সুপরিচিত। অধিকন্তু গান্ধী, জহর আর সুভাষ সম্বন্ধে ছোট বড় মাঝারি অনেক-কিছু বাহির হইতেছে। সেই আবহাওয়াই কালিদাস-হরিদাসের "অভেদানন্দ" দেখা দিল।

দাদা-ভাই মুখোপাধ্যায়েরা বাংলা লেখে ভাল। বাঙালী-জাতের একাল-সেকাল তলাইয়া-মজাইয়া বুঝিবার জন্য দরদ আছে। অধিকন্তু দুইজনেই খোঁজ চালাইবার জন্য মেহনৎ করিতে অভ্যস্ত। সম্প্রতি "ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়" (১৮৬৫-১৯৪৮) সম্বন্ধে হরিদাসের বাংলা ও ইংরেজী রচনা বাহির হইয়াছে। পাকা লেখকদের সাধনায় অভেদানন্দ-পূজা দেশের ভিতর দস্তুর-মাফিক ইজ্জৎ পাইবে সন্দেহ নাই।

লেনিনের পক্ষে স্তালিন যা, বিবেকানন্দ'র পক্ষে অভেদানন্দ তা। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তনে বিবেকের পরবর্তী ধাপ অভেদ। দুনিয়ার নরনারী বিবেক-অভেদকে দেখিয়া বেদান্ত পাইয়াছিল কিনা জানি না। তাহারা পাইয়াছিল দুটা মানুষের মতন মানুষকে, দুই দিগ্‌বিজয়ী বীর পুরুষকে। দুনিয়াকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নয়া গড়ন দিতে পারে এমন দুই বাপ্‌কা-বেটাকে।

বাঙালীর বাচ্চারা,—ভারত-সন্তান ইয়োরামেরিকার যে-কোনো লোকের সংগে খোলা মাঠে পাঞ্জা কষিতে সমর্থ,—এই দৃশ্য দেখিয়াছিল জগতের লোক বিবেক-অভেদের পাঁয়তারায়। সেই মুহূর্তে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আধুনিক ইয়োরামেরিকার সংগে বর্তমান ভারতের সাম্য, ঐক্য বন্ধুত্ব, সহযোগিতা।

এই দুই বংগবীরের মারফৎ ভারতমাতা দুনিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিল রক্ত মাংসের স্বধর্ম, শক্তি-যোগ, দিগ্‌বিজয়ের সাধনা। বিবেক-অভেদ সেকেলে বাসি ভারতের সওদাগর নন। এই দুই বংগবীর তাজা রক্তমাংসওয়ালা করিৎকর্মা জীবনের ভারতীয় প্রতিনিধি।

বিবেক-অভেদের জীবন ও কর্মধারা ইয়োরামেরিকা হইতে ভারতে আমদানি করিয়াছে এ কালের নয়া নয়া আধ্যাত্মিকতা। এই দুই বিশ্বশক্তির বেপারীর মারফৎ ভারত সন্তানেরা পাইয়াছে মার্কিন কর্ম-সংগঠন ও অপূর্ব আশানিষ্ঠা, জার্মাণ ফিখ্‌টের আদর্শ-প্রীতি ও নীট্‌শের মানুষবীর, ফরাসী কঁৎ-এর সমাজ-পূজা ও রেঁনার যুক্তি-যোগ, আর ইংরেজ কার্লাইলের চাবুক, জুতা ও লাঠ্যৌষধি।

এই সব নতুন নতুন জীবন বেদ আসিয়া আমাদের সেকেলে উপনিষদ-বেদান্ত-গীতাকে সুভাষী যুগের কর্মকাণ্ডের জন্য চাংগা করিয়া তুলিয়াছে। সুভাষের পরবর্ত্তী বংগবীরেরা ভারতে ও দুনিয়ায় নয়া নয়া দিগ্‌বিজয়ের জন্য খাড়া হইতেছে। জয় 'বিবেকানন্দ'র জয়, জয় অভেদানন্দ'র জয়।

৪৫, গিরিশ বোস রোড,
কলিকাতা—১৪
১ জুন, ১৯৪৬

বিনয় সরকার
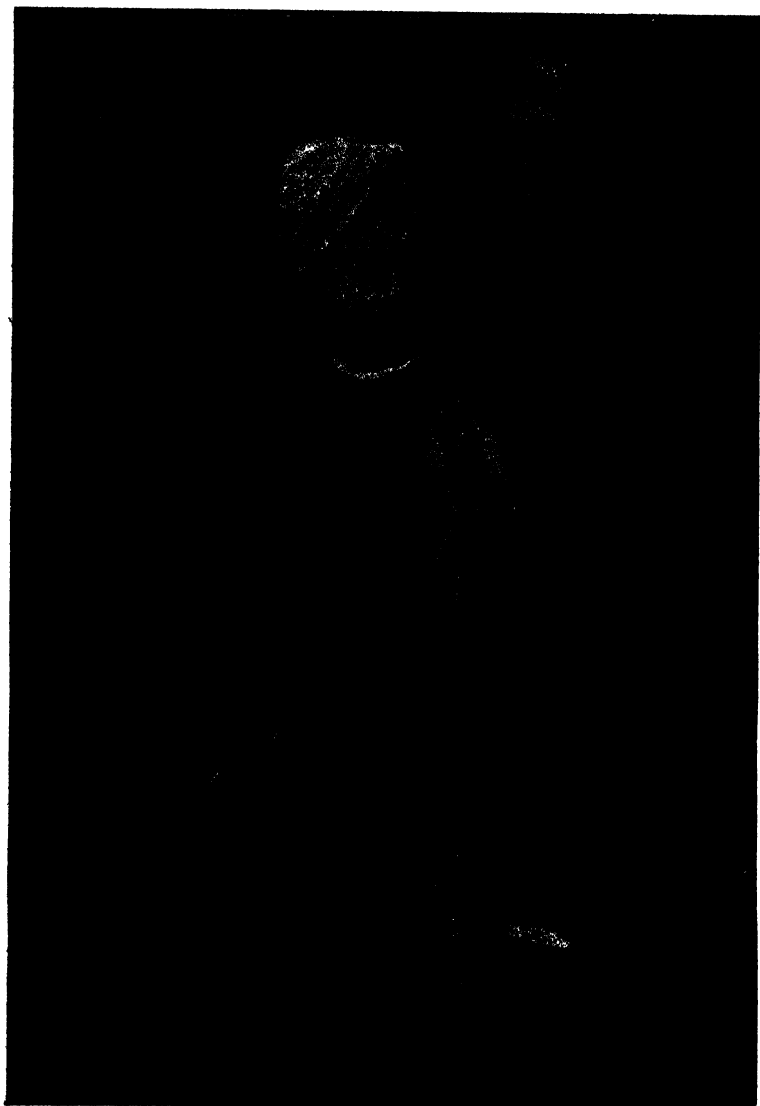
Swami Abhedananda

মুক্তি-আন্দোলনে অভেদানন্দ

(১৮৯৬-১৯০৬)

বিবেকানন্দ'র জীবনবেদ

স্বামী বিবেকানন্দ যে জীবনবাদ প্রচার করেছেন তার আরম্ভ বেদান্তের 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জানো—এই মন্ত্র নিয়ে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য বজ্রনাদ সেই মন্ত্র-পাঠের প্রথম অভিজ্ঞতা। এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার পথে ইয়োরোপীয় বাহ্য-সভ্যতার সহায়তায় গণমুক্তি তার পরিণতি। গণমুক্তির অর্থ সমগ্র জাতির শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। এই জন-জাগরণের পরিণাম জাতীয় বিপ্লব—জাতীয় মুক্তি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনকে বলা হয় জাতীয় আন্দোলন। স্বামী অভেদানন্দের ভাষায় "বিবেকানন্দ যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তা স্থানীয় অথবা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। আমি বলছি, এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে।" "লেক্‌চারস্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের মধ্যে বারবার অভেদানন্দ সেই একই কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন (পৃঃ ২০, পৃঃ ১১১)। অভেদানন্দের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ "বর্তমান ভারতের স্বদেশ-সেবক সন্ন্যাসী"। বিবেকানন্দের সন্ন্যাসবাদ জীবনবাদের নামান্তর মাত্র।

জাতীয় মুক্তির উপায়

বিবেকানন্দ জাতীয় মুক্তির জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন বুঝেছিলেন—প্রথমত, দেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, দ্বিতীয়ত, বহির্জগতে ভারত-প্রচার দ্বারা বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের অনুকূলে জনমত সংগঠন করা। বিবেকানন্দের পর অভেদানন্দও সমগ্র সত্তার

গভীরে এই দ্বিবিধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিবেকানন্দ যখন সবেমাত্র ইয়োরো-আমেরিকায় আন্দোলন আরম্ভ করেছেন সেই সময় অভেদানন্দ "দি হিন্দু প্রিচার" (১৮৯৫) প্রবন্ধে বলেন : একদিকে এখন আমাদের সামাজিক দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং অন্যদিকে দুনিয়ার কাছে ভারতের বাণী নিয়ে যেতে হবে। স্পষ্টত, বিবেকানন্দের পথেই তিনি ভারত-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি বিবেকানন্দের আহ্বানে ইয়োরো-আমেরিকায় গিয়ে ভারত-প্রচার আরম্ভ করেন (১৮৯৬)।

বিবেকানন্দ-আন্দোলনে অভেদানন্দ

কার্যকরী বৈদেশিক প্রচার জাতীয় আন্দোলনের নামান্তর মাত্র। অভেদানন্দ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ১৮৯৬ হ'তে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত যে প্রচার কার্য চালনা করেন, তা' প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন। আমেরিকায় প্রচার আরম্ভ করবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের মনে ভারতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলেন। ফলে জনসাধারণ হ'তে পণ্ডিত-মণ্ডলী পর্যন্ত—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ—সকলেই ভারতবর্ষের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠেন। এমন কি আমেরিকার তদানীন্তন সভাপতি ম্যাক্‌কাইন্‌লী পর্যন্ত স্বামীজীর কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি স্বামীজীকে "হোয়াইট-হাউসে" আহ্বান করে অভিনন্দিত করেন (১৯শে মে, ১৮৯৮) এবং ইংরেজ শাসনাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রিক অবস্থার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

১৮৯৬ হ'তে আরম্ভ করে ১৯০৬ সালের মধ্যে অভেদানন্দ তাঁর আন্দোলন দ্বারা ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজ-জীবনে এক

অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে তোলেন। এই অভাবনীয় সাফল্যের কারণ, বিবেকানন্দের পর অভেদানন্দই ছিলেন বিবেকানন্দের আরব্ধ-কার্য পরিচালনা করবার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। তখনকার দিনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের লেখা পত্র (বিশ্ববাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬) এক প্রমাণ। অভেদানন্দের পর বিনয় কুমার সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ যে সব মনীষী ইয়োরো-আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজীর কার্যকলাপের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, তাঁদের উক্তিসমূহ আর এক প্রমাণ। তৃতীয় প্রমাণ স্বামীজী সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও সাময়িক পত্রিকাদির মতামত। সেই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, বিবেকানন্দ-আন্দোলন প্রকৃতপ্রস্তাবে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ'র সৃষ্টি।

১৯০৫-স্রষ্টা ১৮৯৩

যাঁরা বস্তুনিষ্ঠভাবে ভারতীয়-মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তাঁরা বলেন, বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে সম্ভব হয় ১৯০৫ সালের বিপ্লব, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকা হয় রচিত। বিবেকানন্দ ইয়োরো-আমেরিকায় আন্দোলন আরম্ভ করেন ১৮৯৩ সালে; আন্দোলন আরম্ভ করবার পরই তিনি সেখান থেকে চলে আসেন এবং ১৯০২ সালে দেহরক্ষা করেন। যে আন্দোলনের ফলে ১৯০৫ সালের বিপ্লব সম্ভব হয়েছে বলা হয় সেই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বিবেকানন্দের দ্বারা, কিন্তু সেই আরব্ধ আন্দোলনকে যিনি বিরাট সাফল্যের সংগে ব্যাপকতর ও দৃঢ়তর ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি হলেন অভেদানন্দ (১)। ১৮৯৯ সালে যখন অভেদানন্দ আমেরিকার কর্মক্ষেত্র

(১) রাজেন্দ্রলাল আচার্য লিখিত "আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ" (বিশ্ববাণী, ভাদ্র-মাঘ, ১৩৪৮)।

হ'তে বিদায় গ্রহণ করতে চাইলেন, বিবেকানন্দ তাঁকে সেই অনুমতি দিলেন না, বললেন, অন্ততঃ আরও দশ বৎসর তোমায় এখানে কাজ করতে হবে। অভেদানন্দ স্বামীজীর সে-আদেশ শিরোধার্য করে নেন এবং ১৯২১ সাল পর্যন্ত বিবেকানন্দের আরব্ধ আন্দোলনকে অসামান্য যোগ্যতার সহিত চালিয়ে যান। সুতরাং মানতেই হবে পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ-আন্দোলনে অভেদানন্দের অবদান খুবই বেশী।

জাতীয় মুক্তিতে বৈদেশিক প্রচার

জাতীয় মুক্তির জন্য একদিকে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য, অন্যদিকে প্রয়োজন জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠন। আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের জন্য দরকার বৈদেশিক প্রচার। বৈদেশিক প্রচার কার্যের ফলে গড়ে উঠে শ্রদ্ধাশীল আন্তর্জাতিক জনমত এবং এই আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা আবার দেশের মধ্যে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে করে প্রভূত সাহায্য—জাতীয় ঐক্য-বোধকে করে তুলে অগ্রসরশীল। এর ফলে সম্ভব হয় জাতীয় বিপ্লব। এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেতাজী ১৯৩৫ সালের শেষ দিকে এক প্রবন্ধে বলেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈদেশিক প্রচার একরূপ অপরিহার্য। এই বৈদেশিক প্রচার কার্যের প্রয়োজনীয়তার কথা নেতাজী হরিপুরা কংগ্রেস-সভাপতির ভাষণে আরও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন (২)।

বহির্ভারতে প্রচার চালাবার যে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের কথা নেতাজী ঘোষণা করেন ১৯৩৫-৩৮ সালে—সেই অতি প্রয়োজনীয় আন্দোলন পরিচালনার কথা স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন ১৮৯৩ সালে,

(২) স্পিচেস্ অ্যাণ্ড রাইটিংস অব্ সুভাষ বোস (লাহোর ১৯৪৬), পৃঃ ৪২, ১৬৮

অভেদানন্দ সেই কথা প্রচার করেন ১৮৯৫ সালে। বস্তুত, বিবেকানন্দ এবং অভেদানন্দের দ্বারাই বৈদেশিক প্রচার আরম্ভ হয়। বিবেকানন্দের প্রচার কার্য আরম্ভ হবার পর তাঁর আহ্বানে অভেদানন্দ বহির্ভারতে প্রচার সুরু করেন (১৮৯৬)। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন ভাবে অভেদানন্দ ভারত-প্রচার পরিচালনা করে ১৯০৫ সালের মধ্যে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারতের স্বপক্ষে এক বিরাট জনমত জাগিয়ে তোলেন। স্বামীজী এ কাজ করেন প্রধানত ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার বাণী প্রচারের দ্বারা। এই সময়ে প্রকাশিত স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর দিকে তাকালেই এ-উক্তি সপ্রমাণ হবে। ১৯০৫ সালের প্রথম ভাগের মধ্যে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তা হলো প্রধানত এই : "রি-ইন্‌কার-নেসন্" (১৯০০), "স্পিরিচুয়েল্ আন্-ফোল্ডমেণ্ট" (১৯০১), "ফিলজপি অব্ ওয়ার্ক" (১৯০৩), "ডিভাইন্ হেরিটেজ অব্ ম্যান" (১৯০৩) "সেল্‌ফ্ নলেজ্" (১৯০৫), "দি গস্‌পেল্ অব্ রামকৃষ্ণ" (১৯০৫)।

ব্রুক্‌লিন ইন্‌ষ্টিটিউটে অভেদানন্দের বক্তৃতা

স্বামীজী যখন ভারত-প্রচার দ্বারা পাশ্চাত্যবাসীদের মনে ভারত ও ভারতবাসীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুললেন ঠিক সেই সময়েই (১৯০৫) ভারতে এলো বিপ্লব-স্রোত। এই সময় পাশ্চাত্য-বাসিগণ স্বভাবতই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির স্বরূপ কী, তার আশা আকাংখা কী, তার অভাব অভিযোগ কী,—তা জানবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে। এই ১৯০৫ সালেই আমেরিকার "ব্রুক্‌লিন ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সেস্" নামক পরিষদে বক্তৃতা করবার জন্য অভেদানন্দের কাছে আহ্বান এলো। স্বামীজী সময় ও সুযোগ বুঝে এইবার ভারতের ধর্ম,

রাজনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রিক অবস্থা কী এবং ভারতবাসীর দাবী কী তা ইয়োরোমেরিকার কাছে উপস্থিত করতে আরম্ভ করলেন (১৯০৫-৬)। স্বামীজীর এই ভারত-প্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিদেশীর অন্যায় আক্রমণ হতে রক্ষা করা এবং সেই সংস্কৃতির প্রতি জাতির শ্রদ্ধা জাগিয়ে ভারত-বিপ্লবের সহায়তা করা (৩)।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

ইংরেজ ভারত শাসন করতে আরম্ভ করেই বিজাতীয় বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করতে চেয়েছিল এবং সাম্রাজ্যনীতি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সমস্ত পৃথিবীর কাছে ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে চালিয়েছিল অতি-জঘন্য মিথ্যা প্রচার। স্বামীজী "ব্রুক্‌লিন্ ইন্‌ষ্টিটিউট্" হ'তে সেই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করে দুনিয়ার কাছে উপস্থিত করলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ। স্বামীজী ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তন্ন তন্ন করে আলোচনা চালিয়ে দেখালেন, পৃথিবীর অন্য সব জাতি যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবেছিল সেই সময়ই ভারতবর্ষ ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভুত উন্নতি সাধন করেছিল— বীজগণিত, জ্যামিতি, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্" গ্রন্থের পাতায় পাতায় সেই কথা খোদাই করে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সত্য পরিচয় দিয়ে পাশ্চাত্যবাসীদের স্বামীজী বলেন, ডারউইনের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতবর্ষ সুদূর অতীতেই বিবর্তনবাদের

---

(৩) বিশ্ববাণী, জুন, ১৯৪১, পৃঃ ৩৩

সন্ধান পেয়েছিল, পৃথিবীই যে প্রকৃত পক্ষে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে তার কথা প্রচার করেছিল, আবিষ্কার করেছিল দার্শনিক চিন্তার চরম সত্যকে, জেনেছিল বিজ্ঞানসম্মত ধর্মতত্ত্ব, উপলব্ধি করেছিল নিখিল বিশ্বের নানা বৈচিত্র্য একেরই প্রকাশ।

ইংরেজ শাসনের কুকীর্তি

ভারতবর্ষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী প্রচার সুরু করে—ভারতবর্ষের ধর্ম নেই, দর্শন নেই, বিজ্ঞান নেই, উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নেই, নেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্" (১৯০৫-৬) এই মিথ্যা প্রচারের একটা অতি-উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ। গ্রন্থের উদ্দেশ্য কী তা জানাতে গিয়ে স্বামীজী লিখেছেন, "সংস্কারমুক্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে ঘটনাবলী বিবৃত করা এবং আমেরিকাবাসীদের মনে ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে তা নিরসন করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য (৪)।

ইংরেজ শাসকের মস্ত বড় গর্ব তারা আমাদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে আমাদের মানুষ করে তুলেছে। এর ভেতরে সত্য কতটুকু? স্বামীজী ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিধানের ইতিহাস আলোচনা করে দেখান, হিন্দু-সমাজ চিরদিনই জন-সাধারণের শিক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিল। ব্যাপকভাবে জন-শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতবর্ষ যে প্রাচীন কালেই করছিল তা নয়, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভেও দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা প্রদানের বিধিব্যবস্থা নিতান্ত কম ছিল না। বৃটিশ শাসক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করবার সময় দেশীয় শিক্ষাবিধির অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা দেখেন তা অতি বিস্ময়কর।

---

(৪) ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্ (নিউইয়র্ক, ১৯০৬), পৃঃ ৫

১৮২২ সালে মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার টমাস মুনরো দেখতে পান, প্রাচীন হিন্দুপ্রথায় এক মাদ্রাজ প্রদেশেই ১২,৪৯৮টি স্কুল ও কলেজ বিদ্যমান; ১৮২৩ সালে বম্বের গভর্ণর দেখেন, বম্বে প্রদেশে ১,৭০৫টি স্কুল ও কলেজ বর্তমান; ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক জানতে পারেন একমাত্র বাংলা দেশেই ৩,৩৫৫টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এই সব নজির দেখিয়ে স্বামীজী আমেরিকাবাসিদের বলেন,."এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে হিন্দুগণ সব সময়ই কি ভাবে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী ছিল" (৫)।

ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় স্কুল ও কলেজগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথচ যে-নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা এলো তাও সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হলো না। ফলে দেশের বুকে নেমে এলো অজ্ঞতার অন্ধকার। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত না হওয়াতে শিক্ষিত শ্রেণীর সহিত জনসাধারণের বিচ্ছেদ ঘট্‌লো অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যে ভাঙন ধরলো। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের যুবকদের বিজাতীয় মনোবৃত্তি-সম্পন্ন করে তোলা। প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে হয়তো জাতীয়-জীবনে স্বাধীনতার উন্মাদনা প্রবল হয়ে বৃটিশ প্রভূত্বের অবসান চাইবে। ইংরেজ শাসকের এই ছিল ভয়।

মিশনারী স্কুল কলেজ-সমূহ যুবকদের মানুষ করবার নামে তাদের অমানুষ করে তুলতে থাকে, তারা যুবকদের কাছে প্রচার করতে থাকে হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থা অতি জঘন্য—নরকের হাত থেকে যুবকদের বাঁচাতে পারে একমাত্র খৃষ্টধর্ম। একটা জাতির সর্বনাশ এর চেয়ে

(৫) ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্‌ (১৯০৬), পৃঃ ১৯৪

আর কি ভাবে করা যায়? ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা প্রদানের এই কুৎসিত চেহারাটা আমেরিকাবাসীদের কাছে তুলে ধরে' স্বামীজী বলেন, হিন্দু ছাত্র ছাত্রিগণ মিশনারীদের স্কুল কলেজে যায় জ্ঞানলাভের জন্য, কিন্তু যেখান হতে তারা ফিরে আসে কতকগুলি কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদ নিয়ে—তারা হয়ে উঠে দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরোধী (৮)।

বিকৃত, বিজাতীয় শিক্ষাবিধি প্রবর্তন সত্ত্বেও আমরা সে-শিক্ষার দ্বারা লাভবান হয়েছি সন্দেহ নেই; ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্যই আমাদের মনে রাষ্ট্রীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। তাই উদ্দেশ্য সাধু না হলেও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমরা ইংরেজ জাতির নিকট কৃতজ্ঞ। স্বামীজী নিজে সে কৃতজ্ঞতা আমেরিকাবাসীদের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে-শিক্ষা কত অল্প! দীর্ঘ ইংরেজ রাজত্বের পরও এদেশে নাম সই করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা কি নিতান্তই নগণ্য নয়? ইংরেজ শাসক আমাদের কার্যকরী শিক্ষাদানের কি কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করেছে? জে, টি স্যাণ্ডারল্যাণ্ড দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করে বলেছেন, শিক্ষা বিষয়ে ঔদাসীন্য ভারত-শাসনে ইংরেজের চরম কলঙ্ক।

জাতীয়তা গঠনের জন্য ভারতবর্ষ কী শিক্ষাব্যবস্থা চায়, কী ভাবে তা পরিচালিত হওয়া দরকার, শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতের দাবী কী তা পাশ্চাত্যবাসী স্বামীজীর কাছে জানতে পারলো। স্বামীজী বলছেন, আজ ভারতবর্ষের দরকার গণ-শিক্ষা প্রচারের, তাদের দিতে হবে অবৈতনিক শিল্প ও কার্যকরী শিক্ষা, তাদের প্রয়োজন জাতীয় বিশ্ব-

(৮) ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল, পৃঃ ২০১

বিদ্যালয়ের, তারা চায় মানুষ হয়ে উঠবার শিক্ষা। হিন্দুগণ ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছে প্রতিভা তাদের পাশ্চাত্যবাসীদের চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়। ইংরেজ শাসক ভারতবাসীদের প্রকৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে না, হিন্দুগণ নিজেরাই যথাসাধ্য স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনে হৃত-সর্বস্ব ভারতবাসীর পক্ষে স্বচেষ্টায় কতটুকু করা সম্ভব! ইংরেজ শাসন যে আমাদের সর্বহারা, পীড়নে অত্যাচারে সম্বলহীন, সহায়হীন করে তুলেছে (৭)।

১৯০৫ সালে হৃত-সর্বস্ব ভারতবাসী যে-জাতীয় দাবী নিয়ে আন্দোলন সুরু করে, স্বামীজী স্বভাবতই সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে পারেন নি। সেই বিপ্লব-যুগে স্বামীজী ভারতের দাবীকেই স্বীকার করে আমেরিকাবাসীদের বলেন, ভারত-বাসীর কাছে আজ একটি মাত্র প্রশ্ন এবং তা হলো বাঁচবার প্রশ্ন—"টু-ডে দি কোস্‌চেন ইজ্ হাউ টু লিভ্"। স্বামীজী ঘোষণা করেন, বৈদেশিক শাসনে সর্বহারা ভারতবাসীর কাছে আজ খাওয়া পরার চেয়ে বড় প্রশ্ন আর কিছুই নেই। "আজ জনসাধারণ অতি দরিদ্র। এদের আজ দরকার অন্নবস্ত্র ও মাথা গুজ্‌বার জায়গা। এদের পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ পর্যন্ত নেই" (৮)। এই তো ছিল ১৯০৫ সালে ভারতের অবস্থা, অবশ্য সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন আজও হয় নি। স্বামীজী ভারতবর্ষের সামাজিক দুর্গতির কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন; ইতিপূর্বেই হিন্দুসমাজে সংগঠনের আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে, অথচ যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হয় নি কেন?

---

(৭) ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্, পৃঃ ২১৪

(৮০) ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্, পৃঃ ১১১

স্বামীজী তার উত্তরে বলেছেন, "বিদেশী ও সহানুভূতিহীন রাজশক্তি লোভ, স্বার্থ ও অত্যাচার বশীভূত হয়ে এর উচ্চ কর্ম্ম-চারীদের সাহায্যে হিন্দুদের সামাজিক অগ্রগতিকে প্রচণ্ড-ভাবে বাধা দিচ্ছে। তাদের এই প্রতিরোধের ফলে হিন্দু-জাতির প্রাণশক্তি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।" এই অসহায়তার মধ্যে সামাজিক উন্নতি কতটুকু সম্ভব। স্বামীজী তাই ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, সপ্রমাণ করে দেখান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কি করে ব্যবসা-বাণিজ্য হতে ভারতীদের বঞ্চিত করেছে, সর্বপ্রকার শিল্প ধ্বংস করেছে এবং কোটি কোটি নরনারীকে হৃতসর্বস্ব করেছে। হিন্দুর সামাজিক দুর্গতির কারণ তো এই। অথচ খৃষ্টীয় মিশনারীরা বলে, সামাজিক দুর্দশার কারণ হিন্দুর ধর্মবিধি-ব্যবস্থা। স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের জানালেন, মিশনারীরা স্বীকার করতে চায় না যে, অত্যাচারী গভর্ণমেণ্টই প্রকৃতপক্ষে এর জন্য দায়ী—হিন্দুধর্ম নয়। পক্ষান্তরে এই সব মিশনারীরাই গভর্ণমেণ্টের হয়ে হিন্দু-সমাজ ধ্বংসের কাজে নানা ভাবে চেষ্টা করছে। ভারতবাসী আর মিশনারীদের দ্বারা তাদের সমাজ ধ্বংস হতে দেবে না। ভারতবাসী অনেক দুঃখ সহ্য করেছে, তারা কিছুমাত্র অবিচার সইতে আর রাজী নয়। স্বামীজী বললেন, হিন্দুসমাজ জেগে উঠ্ছে—ইয়োরোপীয় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সহিত সার্বভৌম উদার মতবাদের পটভূমিকায় হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে হবে। হিন্দু একথা বুঝতে পেরেছে। সামাজিক রূপ পরিবর্তনের জন্য আজ দরকার বেদান্ত। কেননা, বেদান্তের মধ্যে রয়েছে মহামিলনের বাণী, বিভেদ ও বিরোধের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মন্ত্র, ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার উর্দ্ধে মানুষকে নিয়ে যাবার অগ্নিময়ী আদর্শ।

মুক্তি-আন্দোলনে আত্মিক শক্তি

বেদান্তের মূলমন্ত্র হলো জীবননিষ্ঠা। এর লক্ষ্য হলো আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশ। জীবনকে অস্বীকার করে এ দর্শনের জন্ম নয়। এর প্রতিষ্ঠা জীবনবাদে। তাই স্বামীজী দেশে বিদেশে করলেন বেদান্ত প্রচার—জাতির মুক্তির জন্যও তিনি স্বীকার করেছেন বেদান্ত। ভারতীয় সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বেদান্ত প্রচার দ্বারা তিনি বিদেশে জাগিয়েছেন ভারতের প্রতি হাজার হাজার নরনারীর সহানুভূতি। দেশের মধ্যে বেদান্তের কথা বলে দেশের ভীরু, আত্মবিশ্বাসহীন জাতির জীবনে এনেছেন অনন্তযৌবনের বেগ ও উন্মাদনা, করেছেন জাতীয় ঐক্য গড়নের ভূমিকা। অর্থাৎ মোটের উপর এই প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি ভারতের মুক্তি-আন্দোলনেরই করেছেন সহায়তা। নিরন্ন ভারত-বাসীর কাছে বেদান্ত-প্রচার অনেকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু, কিন্তু স্বামীজীর কাছে তা উদ্দেশ্য-বর্জিত ছিল না। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, খালিপেটে ধর্ম কি সম্ভব? খালিপেটে ধর্ম যে সম্ভব নয় তা স্বামীজী আর কারো চেয়েই কম জানতেন না। তবে স্বামীজী অর্ধভুক্ত ভারতবাসীকে বেদান্ত চর্চা করতে বললেন কেন? এর কারণ স্বামীজী বুঝেছিলেন জাতীয় বিপ্লবের জন্য দরকার ঐক্যবোধ এবং ঐক্যবোধ আসবে বেদান্তের প্রেরণায়। বেদান্ত দেবে মানুষকে দুর্জয় আত্মিক-শক্তি, যে-শক্তি হলো বিপ্লবের একটি মস্ত বড় উপাদান! একমাত্র অস্ত্রের জোরে পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়। অস্ত্রের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে, তবে একমাত্র অস্ত্রই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করে না। কার্যকরী বিপ্লবের জন্য অস্ত্রের যেমন প্রয়োজন তেমনি দরকার নৈতিক-বলের, বিশেষ করে নিরস্ত্র জাতির পক্ষে আত্মিকশক্তি একরূপ

অপরিহার্য। এই জন্যই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মতবাদের জয়যাত্রা হয়েছে সম্ভব (৯)। নিরস্ত্র অবস্থায় মানুষের সংগ্রাম চালনা সম্ভব একমাত্র নৈতিক শক্তির সহায়তায়। ইংলণ্ড যখন চরম বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল (১৯৪১-৪২), তখন চার্চিল জাতির বৈপ্লবিক চেতনা বজায় রাখবার জন্য প্রচার করেন আত্মিকশক্তির জয়গান। মুক্তি-আন্দোলনে আত্মশক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বেদান্ত আত্মশক্তির অফুরন্ত উৎস। অভেদানন্দ তাই অধিকারহীন হৃতসর্বস্ব ভারতবাসীর কাছে ঘোষণা করেছেন বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণী। ১৯০৫-৬ সনের বিপ্লব-মুখর ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বার বার প্রচার করেছিলেন একই মন্ত্র। তিনি বলেছিলেন, আমাদের আদর্শ জাতিগঠন, এবং বেদান্ত হবে যে-পথে বিপুল প্রেরণা। কিন্তু একমাত্র এই প্রেরণার বলে দেশ স্বাধীন হতে পারে না, তার জন্য বৈদেশিক প্রচারও প্রয়োজন। এখানেই আসে 'বিশ্বশক্তি সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন (১০)।

মুক্তি-আন্দোলনে বিশ্বশক্তি

একটা জাতির উন্নতি ও অবনতি কেবলমাত্র নিজের দোষ বা গুণের ফলে হয় না, জাতীয় উন্নতি বা অবনতির মূলে থাকে বিশ্বশক্তি সদ্ব্যবহারের খেলা। জাতীয় মুক্তির জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন সংঘবদ্ধ আন্দোলন, তেমনি অন্যদিকে দরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য ও

(৯) "গান্ধী, নন্-গান্ধী অ্যাণ্ড অ্যান্টি-গান্ধী ইন্ দি প্যাটার্ণ অব ইণ্ডিয়ান্ আইডিয়লজিস্" বাই বিনয় সরকার (ক্যালকাটা রিভিউ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮)।

(১০) বিনয় সরকার: দি সায়েন্স্ অব্ হিস্ট্রী অ্যাণ্ড হোপ্ অব্ ম্যানকাইণ্ড (লণ্ডন, ১৯১২)

সহানুভূতি অর্থাৎ বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার (১১)। এ বিষয়ে অভেদানন্দের ছিল সজাগ দৃষ্টি। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "দি হিন্দু প্রিচার" রচনায় এই ইংগিত সুস্পষ্ট। তাই পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে স্বামীজী ভারতের অনুকূলে আন্তর্জাতিক জনমতগঠনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৯০৫ সালে ব্রুক্‌লিন ইনষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। এই বক্তৃতাগুলির সমাবেশেই অল্পদিন পরে রচিত হয় "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপল্" নামক অভেদানন্দর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ (১৯০৬)।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ব্যর্থতা

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগ হ'তে আরম্ভ করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের প্রতি কী অবিচার করেছে, অত্যাচার করেছে, কি ভাবে ভারতের সর্বস্ব শোষণ করেছে তার ঐতিহাসিক বিবরণ স্বামীজীই সর্বপ্রথম আমেরিকাবাসীদের কাছে উপস্থিত করেন। নজিরের পর নজির, প্রমাণের পর প্রমাণ উপস্থিত করে দেখালেন ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস দুঃখ, বেদনা, অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাস, কল্পনাতীত অর্থনৈতিক নিষ্ঠুর শোষণের ইতিহাস, অনাহার ও লক্ষ লক্ষ মানুষের শোচনীয় মৃত্যুর ইতিহাস, অভাবনীয় কর-আদায়ের বেদনাময় কাহিনী—ভারত হতে তার সমস্ত সম্পদ বিলাতে নিয়ে যাবার বিবরণ! এ কথা কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়—ইতিহাসের কথা। বহু ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং ঐতিহাসিকও সে-কথা অস্বীকার

(১১) কালিদাস মুখোপাধ্যায়: "সুভাষচন্দ্র ও বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" (পরাগ—ভাদ্র, বড়দিন ও নেতাজী সংখ্যা, ১৩৫৩) প্রবন্ধে পৃথিবীর মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখানো হয়েছে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার ব্যতীত কোনদেশ কোনদিন স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয় নি।

করতে পারেন নি। স্বামীজী দেখিয়েছেন ইংরেজ শাসনের ইতিহাস কত মর্মান্তিক, কত অসম্ভব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পীড়নের উপর তা প্রতিষ্ঠিত—ইংরেজের সমৃদ্ধি অসহায় দরিদ্র নিপীড়িতদের কত বঞ্চনার দ্বারা রচিত। অথচ বহির্জগতে প্রচারিত হতো, ইংরেজ শাসনে ভারতের সমৃদ্ধি বেড়ে যাচ্ছে—ইংরেজ তার ঘরের টাকা এনে ভারতের সর্ববিধ উন্নতির চেষ্টা করচে। স্বামীজী সেই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত রূপ কী তা জগৎবাসীকে জানালেন এবং জগৎবাসীর কাছে সপ্রমাণ করে দেখালেন, তখনকার রাশিয়ার অত্যাচারী গভর্ণমেণ্টের মতোই ভারত গভর্ণমেণ্টে স্বৈরাচারী।

ভারতে ইংরেজ শাসন জঘন্য স্বৈরাচারের দ্বারা আগাগোড়াই কলঙ্কিত। এই স্বৈরাচার চরম অবস্থায় এলো ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের সময়। সমগ্র বাংলার তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে দেশে অসন্তোষ দাবানলের মতো জ্বলে উঠলো—চারিদিকে বিলাতী মাল বর্জন করা হলো। স্বামীজী এই বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই আমেরিকাবাসীদের কাছে ভারতের রাষ্ট্রিক অবস্থার কথা বলেছেন, বৈদেশিক জনমত গঠনের দ্বারা ভারত-বিপ্লবের করেছেন সহায়তা। স্বদেশসেবক ও মুক্তিপাগল অভেদানন্দ সেদিন দেশের বৃটিশ-বর্জন নীতি সমর্থন করে বলেন, আশা করা যায় এই বর্জন-নীতি স্বৈরাচারী ইংরেজকে আত্মস্থ হতে সহায়তা করবে (১২)।

অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করতে করতে মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে অত্যাচারের অবসান ঘটাবার জন্যে। ১৯০৫ সালে সমগ্র ভারতে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লব এলো

(১২) ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্, পৃঃ ১৬৬

তার মূলে ছিল চিরাচরিত বৃটিশ স্বৈরাচার। ভারতের অবস্থা যারা ভালো জানেন না তারা হয়ত ১৯০৫ সালের ভারত-বিপ্লবের কারণ ঠিক বুঝতে পারবেন না। সেই জন্যই স্বামীজী ভারতব্যাপী আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে আমেরিকাবাসীদের জানালেন, বৃটিশ স্বৈরাচারের জন্যই ভারতে এসেছে ১৯০৫ সালের বিপ্লব-তরঙ্গ—তাই ভারতের জনসাধারণ আজ গভীর নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে (১৩)।

১৯০৫ সালের মাঝামাঝি হতে ১৯০৬ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত স্বামীজী ভারতের দাবী কী, ভারত কী চায় এবং সে দাবীর কারণ কী তা ইয়োরোমেরিকাবাসীদের জানালেন। এই ১৯০৫ সালেই দেশের লোক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারতের দাবী জানাবার প্রয়োজনের কথা অনুভব করে। ১৯০৫ সালে কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলন চালাবার জন্য যে-প্রয়োজন উপলব্ধি করে, স্বামীজী তার বহু পূর্ব থেকেই স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেই কাজ স্বকীয় পথে আরম্ভ করেন এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লব-তরঙ্গের যুগে প্রত্যক্ষভাবেই ভারতের জাতীয় দাবী বিশ্বের কাছে উপস্থিত করেন। একি জাতীয় আন্দোলনেরই নামান্তর নয়? স্বামীজী কি তাঁর এই সময়ের কার্যকলাপের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই সহায়তা করেন নি? ইতিহাসের জিজ্ঞাসু ছাত্র মাত্রেই স্বামীজীর এই কাজকে দ্বিধাহীন ভাষায় জাতীয় বিপ্লবে গড়নের কাজ ব'লে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার না করে পারে না। স্বামীজীর "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্‌" গ্রন্থের বক্তৃতাগুলি শুনেই ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহুসংখ্যক নরনারী ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে প্রথম সত্য পরিচয় পেলো। তারই ফলে

(১৩) ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্‌, পৃঃ ১৩৭

পাশ্চাত্য দেশে বহু নরনারী ১৯০৫ সালের ভারত-বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পেরেছে। সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রকাশিত অভিমতগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোক সম্পাত করে। "ওয়াশিংটন ইভ্‌নিং ষ্টার" (৪ঠা আগষ্ট ১৯০৬) লিখেছে: "আমেরিকানগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা জানতে চায় সেই সব কথাই সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্' গ্রন্থে। বইটা সেই দিক দিয়েও বিশেষ মূল্যবান"। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। মোটের উপর এ-কথা স্বীকার করতেই হবে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের ইতিহাসে গ্রন্থখানা যুগান্তরকারী, কারণ পাশ্চাত্যের শিক্ষিত মহলে বইখানা একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ফলে "তখনকার ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ পুস্তক ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। দীর্ঘকাল পরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়" (১৪)।

১৯০৫ হইতে ১৯০৬ সালের প্রথম পর্যন্ত পাশ্চাত্য খণ্ডে ভারতের জাতীয় দাবী উপস্থিত ক'রেই স্বামীজী ভারতবর্ষে চলে এলেন। ভারতে আসার অল্পকাল পূর্বে ব্রুক্‌লিন্ ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল্" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্বামীজী উক্ত গ্রন্থ মুক্তিকামী ভারতের অনাগত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এর দ্বারাও বুঝতে পারা যাবে, গ্রন্থখানি বিপ্লবী দৃষ্টি দিয়ে রচিত। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সহায়তা করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

(১৪) হরিদাস মুখোপাধ্যায়: 'নবযুগের মানুষ' (কলিকাতা, ১৯৪১), পৃঃ ৬১

অভেদানন্দের ভারত পর্যটন

বিপ্লবী ভারতের পক্ষ হ'তে এই সময় স্বামীজী জাতীয় আন্দোলন চালিয়েছিলেন বলেই ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে তিনি যখন ভারতে এলেন তখন সমগ্র ভারতবাসী তাঁকে রাজোচিত সংবর্দ্ধনা জানালো। ভারতের দিকে দিকে হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে অভেদানন্দের জয়ধ্বনি মন্ত্রিত হলো। ভারতবাসী স্বীকার করলে স্বামীজী ভারতবর্ষকে সভ্য জগতের কাছে গৌরবের অধিকারী ক'রেছেন, ভারতের অনুকূলে বিরাট আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলেছেন। ভারতবাসী বুঝলো স্বামীজী সত্যই দিগ্‌বিজয়ী কর্মবীর (১৫)।

স্বামীজী মনে করতেন ভারতের জাতীয় মুক্তির জন্য একদিকে দরকার ভারতের সার্বভৌম আধ্যাত্মিক সাধনার বিস্তার, অন্যদিকে দরকার ইয়োরোপের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় ব্যবহার। ভারতবর্ষ ইয়োরোপীয় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা গ্রহণ না করলে শুধু অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বারা জাতি হিসাবে বাঁচতে পারবে না, অন্য দিকে ইয়োরোপ যদি ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট না হয় তবে তার পক্ষেও সগৌরবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য দরকার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব-সমন্বয়। রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম এ কথা উপলব্ধি করেন এবং সেই মিলনের কাজে হাত দেন (১৬)। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা সেই মিলনের বাণী প্রচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের আদর্শ গ্রহণ করেন প্রধানত

(১৫) স্বামী শংকরানন্দ: "জীবনকথা" (১৩৫৩) গ্রন্থের 'ভারতে ছয় মাস' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য

(১৬) অমিত সেন: "নোটস্ অন্ দি বেঙ্গল রেনেসাঁস্" (বম্বে ১৯৪৬), পৃঃ ৩-৪

ইয়োরোপীয় সাহিত্য হ'তে। কিন্তু ব্যক্তিগত সংযোগ ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে অন্যদেশীয় আদর্শ যথাযথ গ্রহণ ও তার সুপ্রয়োগ সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের দ্বারা সেই কাজ আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের কথা বলতে গিয়ে এ কথাই বলেছেন, বিবেকানন্দ একদিকে পশ্চিমকে অন্যদিকে পূর্বকে রেখে মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের দ্বারা জাতীয় জীবন গড়নের আদর্শ স্থাপন করেন (১৭)। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন ইয়োরোপীয় আদর্শ যদি আমাদের গ্রহণ করতে হয় তো তা ধার করলে চলবে না। ধার ক'রে মানুষ কখনো বড় হতে পারে না। প্রতিদান না দিয়ে গ্রহণ করলে মনুষ্যত্বের হয় লাঘব। বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের ইয়োরোপ হ'তে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের দিতে হবে আমাদের অধ্যাত্ম-সভ্যতার আদর্শ। এমনি পারস্পরিক আদান-প্রদানের দ্বারাই উভয়ের মঙ্গল সাধিত হবে। স্বামীজী নিজে সেই কাজ ক'রেছেন সারা জীবন। বিবেকানন্দের মতই অভেদানন্দ বুঝেছিলেন জাতীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব-সমন্বয়। তিনি সে-কথাই বারবার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে প্রচার করেছেন। বিবেকানন্দের মতো তিনি বুঝেছিলেন প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের সংযোগ ছাড়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক আদর্শের আদান-প্রদান সার্থক ও সম্পূর্ণ সফল হ'তে পারে না। বিবেকানন্দের পর অভেদানন্দই ব্যক্তিগত সংস্পর্শের দ্বারা জাতীয় জীবন-গঠনের কাজ করেন সব চেয়ে বেশী (১৮৯৬-১৯০৬)। তাই অভেদানন্দের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ-সমন্বয়ের প্রয়াস সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অভেদানন্দের ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে ভারতবর্ষ

(১৭) রবীন্দ্রনাথ : সংকলন (১৩৩৯), পৃঃ ৯৫

যেমন উপকৃত হয়েছে, আমেরিকাও তেমনি ভারতীয় আদর্শ গ্রহণের দ্বারা লাভবান হয়েছে। আমেরিকাবাসিগণ ১৯০৬ সালে, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে স্বামীজীকে অভিনন্দন দিতে গিয়ে সেই কথাই স্বীকার করে (১৮)।

আমেরিকায় দশ বৎসর কাজ করবার পর স্বামীজী যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন তিনি সঙ্গে করে আনলেন পাশ্চাত্যসভ্যতার নানা অভিজ্ঞতা, তিনি জেনে এসেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল প্রকৃতি কী —সেই সভ্যতার গলদ কোথায়। ১৯০৬ সালের প্রথমেই স্বামীজী যখন বিপ্লবমুখী ভারতের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর চেষ্টা হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার যা কিছু ভালো, যা-কিছু জাতীয় উন্নতির সহায়ক তা জাতির কাছে প্রচার করা এবং তার দ্বারা জাতির প্রকৃত উন্নতি বিধান করা। স্বামীজী ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে বুঝতে পারেন পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যে, জাগতিক সভ্যতায় এত উন্নত তার প্রধান কারণ তাদের অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাসের বলে পাশ্চাত্য জাতিরা পৃথিবীময় আধিপত্য বিস্তার করেছে। অন্যদিকে আমাদের নেই আত্মবিশ্বাস, নেই দৃঢ় সংকল্প, প্রতিপদে দ্বিধা-দুর্বলতা —তাই আমরা পরাধীন। স্বামীজী ভারতীয় যুবকদের এ-কথাই বললেন যে, অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়ের বলেই আমরা আমাদের হৃত-গৌরব ফিরে পেতে পারবো, ইংরেজ শাসনের বন্ধন হতে পাবো মুক্তি। স্বামীজী জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাবার জন্যই ভারতব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেও (১৯০৬) বারবার বলেছেন বেদান্তের কথা, কেননা বেদান্তের মূল কথাই হলো আত্মজাগরণ। অর্থাৎ স্বামীজী

(১৮) লেকচারস্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৯

এই সময় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে নানাভাবে নানা চেষ্টার দ্বারা জাতির মুক্তির স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। দেশের যুবকদের বলেছিলেন, দেশের গণ্ডীর সীমা ভেঙে তোমরা বেরিয়ে এস বিদেশে, বিচার ক'রে দেখো তারা কী উপায়ে জাতির উন্নতিবিধান করেছে, তারপর স্থির করো স্বীয় উন্নতির পথ কী। তিনি বারবার বলেছেন, জাতির উন্নতির জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার করতে হবে। জাতির উন্নতির জন্য তিনি ইয়োরোপীয় আক্রমণমুখী ভাবও গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। ইয়োরোপ বড় হয়েছে তার সংগঠন-শক্তির বলে। স্বামীজী দেশবাসীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে বলেন, আমাদের আজ সর্বপ্রথম দরকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো। তা হলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাদের দাবী অস্বীকার করতে পারে।

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলে জাতীয়-জীবনে বিপ্লব আনা অসম্ভব স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করে তোলার চেষ্টা অর্থহীন। স্বামীজী ১৯০৬ সালে সারা ভারতে নানাভাবে নানা উপায়ে জাতীয় ঐক্য সাধনার মন্ত্রই প্রচার করেছেন, যা কিছু ঐক্যের পরিপন্থী তাকেই ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কথা, বলেছেন গণ-শিক্ষার কথা, বলেছেন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, দাবী করেছেন আমাদের ত্যাগ করতে হবে পরনির্ভরশীলতা, শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা আমাদের দাঁড়াতে হবে নিজেদের পায়ের উপর, জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের হতে হবে শিক্ষার রাজ্যে স্বাধীন, সর্বপ্রযত্নে আমাদের করতে হবে স্বদেশী-আন্দোলনের সহায়তা (১৯)।

(১৯) লেকচারস্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩৩৯

জাতীয় মুক্তির জন্য রাষ্ট্রিক আন্দোলনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য রাষ্ট্রিক আন্দোলনকেই একান্ত করলে চলবে না। জাতীয় মুক্তির জন্য রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে জাতির আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির উপায়, গ্রহণ করতে হবে জাতির দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পন্থা, স্বীকার ক'রে নিতে হবে জাতীয় ঐক্য গড়নের ব্যাপক বিধান। ১৯০৫-৬ সালে জাতির মুক্তির জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রিক আন্দোলনকেই খুব বেশী করে গ্রহণ করায় এবং জাতীয় উন্নতির জন্য অন্যান্য দিকে তেমন জোর না দেওয়ায় তিনি জাতির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেছেন, জাতিকে বোঝাতে চেয়েছেন জাতীয় উন্নতির প্রকৃত উপায় কোথায়। স্বামীজী সে-দিন দেশবাসীকে বলেছিলেন, জাতির মুক্তির জন্য শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়— আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের চেষ্টাও করতে হবে, সর্বপ্রকার পরিবর্তনের দ্বারা জাতিগঠন করতে হবে।

এই ভাবে স্বামীজী ১৯০৫-১৯০৬ সালে ভারতের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে জাতীয় আন্দোলনের সহায়তা করলেন। এই সময় স্বামীজী দেখলেন দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন চালাবার জন্য চেষ্টার অভাব নেই, কিন্তু বিদেশে ভারতের দাবী জানাবার মতো মানুষের অত্যন্ত অভাব, বাইরে ভারতের অনুকূলে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলবার জন্য কোন উপযুক্ত ভারতবাসীরই চেষ্টা নেই। তাই ১৯০৬ সালের পর পুনরায় তিনি আমেরিকায় চলে গেলেন এবং আমেরিকায় একরূপ নির্বাসিত হ'য়ে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের কাজ করতে সুরু করলেন। এই কাজের ধারা ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় স্বামীজীর সমস্ত কর্ম-জীবনের মধ্যে জাতীয় মুক্তির সুর অত্যন্ত প্রবল। তাঁর জীবনব্যাপী বেদান্ত

প্রচারের উদ্দেশ্যও ভারতের জাতীয় মুক্তিকে সত্য করে তোলার চেষ্টা—অনাগত স্বাধীনতা-বিপ্লবকে সম্ভব করে তোলা। স্বামীজী অগ্নিমন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষা দিয়ে বলেছেন, বর্তমানে আমরা পরাধীন; স্বাধীনতাই এখন আমাদের একমাত্র কাম্য। এ কি সমাজ-সংসার হতে পলাতক মনোবৃত্তি সম্পন্ন আত্মমুক্তিকামী সন্ন্যাসীর কথা, না জাতীয় মুক্তির জন্য সহস্র দুঃখ-ঝঞ্ঝার মধ্যে অবিচলিত জাতীয় বিপ্লবী-নেতার অগ্নিবাণী? প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে ভারতবর্ষে সাধু-সন্ন্যাসীর তো অভাব হয়নি কোনদিন, ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষির আবির্ভাবও হয়েছে বহু। এ সব সন্ন্যাসীদের ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, দূর থেকে প্রণাম জানিয়েছে, কিন্তু আপনার জন ব'লে গ্রহণ করে নি—তারা এ জগতে স্বর্গের দুর্লভ পারিজাত। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মৃতপ্রায় মানুষের কাছে দেবতার কাম্য উর্বশীর কণ্ঠহারের কোন দাম নেই, তার কাছে একমাত্র লোভনীয় একমুষ্টি অন্ন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ হৃত-সর্বস্ব জাতিকে দিয়েছেন সব পাওয়ার মন্ত্র—তাই জাতির কাছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ গর্ব ও গৌরবের স্তম্ভ! রামকৃষ্ণ দিলেন জাতীয় মুক্তির মন্ত্র, বিবেকানন্দ সেই মন্ত্রবলে করলেন নব্য-ভারতের গোড়াপত্তন, পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের আরব্ধ সাধনাকে অভেদানন্দ করলেন একটা বিরাট আন্দোলনে রূপান্তরিত (১৮৯৬-১৯০৬)।

অভেদানন্দকে বাদ দিয়ে বৈদেশিক ভারত-প্রচারের ইতিহাস (১৮৯৩-১৯০৬) কল্পনা করাও অসম্ভব। অথচ সমাজ-বিপ্লবের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এই বিরাট পুরুষটির কথা অনেকের কাছেই আজ তেমন সুস্পষ্ট নয়। এমনি ক'রে ইতিহাসে অনেক বিরাট পুরুষের ও বিশাল আন্দোলনের যথার্থ পরিচয় সামাজিক আবর্তসংঘাতের ফলে ভবিষ্যযাত্রীর কাছে কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। ইতিহাসে এর নজির

বড় কম নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০২-৮) এই বাংলা দেশের পটভূমিতেই সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটি"র নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে গৌরবময় কাহিনী আজ কয়জন জানেন? কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে যুবক-বাংলার জীবনেতিহাসে তাঁর দান অতি বিরাট (২০)। তেমনি ক'রে অভেদানন্দের নাম এ-যুগে দেশবাসীর কাছে অনেকখানি অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট হলেও বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর ভারতের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

---

(২০) শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সতীশ মুখোপাধ্যায়" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে এপ্রিল ১৯৪৮) ও "লেট সতীশ মুখার্জী" (হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড, ৯ই মে ১৯৪৮) প্রবন্ধ পঠিতব্য।

বংগবিপ্লবে অভেদানন্দ

(১৯০৬)

স্বামী অভেদানন্দ দিগ্বিজয়ী বৈদান্তিক ও বৃহত্তর ভারতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ভারতের নব্য জীবনেতিহাসে অমর। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তাঁর এই যোগ্য গুরুভ্রাতা পাশ্চাত্যে গমন করেন। তারপর থেকে আগামী প্রথম দশ বৎসর (১৮৯৬-১৯০৬) তিনি অতিবাহিত করলেন রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে। বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মকে অভেদানন্দ পাশ্চাত্য জগতে শুধু বজায়ই রাখেননি, তাকে নানাদিক থেকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন (১)। পরবর্তীকালে বিদেশ-অভিজ্ঞ ভারতীয় মনীষিগণ সেই বিজয়াভিযান শ্রদ্ধার সংগেই স্বীকার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সুবিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর সুরেন দাসগুপ্তের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: "স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমেরিকায় ভারতবর্ষের এই অমোঘ বাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মহাগৌরবের বোধিবৃক্ষের বীজ আমেরিকাভূমিতে প্রোথিত করেন। স্বামী অভেদানন্দ আপ্রাণ সাধনার বারি সঞ্চারে এই বীজটিকে পত্রপুষ্পে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমেরিকার নানাস্থানে তাঁহার এই দেদীপ্যমান কীর্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।" উদাহরণ

---

(১) হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত "কর্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ" (প্রদীপ, ২২শে আশ্বিন, ১৩৪৯) ও "স্বামী অভেদানন্দ—এ বার্থডে ট্রিবিউট" (অমৃত-বাজার পত্রিকা, ৮ই অক্টোবর, ১৯৪৭) দ্রষ্টব্য।

বাড়িয়ে লাভ নেই। ঐতিহাসিক বিচারে এটুকু অনস্বীকার্য সত্য যে, রামকৃষ্ণ-আন্দোলন বর্তমান জগতে যে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা পেয়েছে, তার মূলে বিবেকানন্দের দানের সংগে অভেদানন্দ'র দানও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বিনয় সরকার লিখেছেন: "রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাযুগের প্রথম ঘটনাগুলির ভিতর বিবেকের কথা বলতে গেলে অভেদকে টানতে হবে আর অভেদের কথা বলতে গেলে বিবেকেও টানতে হবে। যুবক-ভারতের ইতিহাস যারা আলোচনা করতে চায় তারা এই দু'জনকে অন্ততঃ সেই দশবছরের জন্য জার্মাণ সমাজতন্ত্রী মার্ক্স ও এঙ্গেল্সের মতন পুরামাত্রার সহযোগীরূপে বিবৃত করতে বাধ্য" (২)। আজকের দিনে নানা সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ঘটনা-বিপ্লবের মধ্যে অভেদানন্দ'র নাম অনেকের নিকটই অস্পষ্ট বা অজ্ঞাত থাকলেও বাঙালী জাতির নব্য জীবন-সৃষ্টির যে বৃহৎ ইতিহাস তাতে তাঁর নাম অতি সুস্পষ্ট। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর ভারতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অভেদানন্দ যখন স্বদেশে সাময়িকভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন সমগ্র ভারত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে অভেদানন্দ-পূজার আয়োজন করেছিল। অভেদানন্দের ভারতব্যাপী মর্যাদাপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেদিন বাঙালী জাতির জাগ্রত প্রাণেরই মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় স্বার্থ

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অভেদানন্দ যখন সাময়িকভাবে স্বদেশে পদার্পণ করেন, তখন চারিদিকে চলছে গৌরবময় বংগবিপ্লব। সেই বিপ্লব-

(২) হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ ১১)

স্রোতে সেদিন অভেদানন্দও ঢেলেছিলেন স্বকীয় পথে আপন সাধনার ধারা। সজ্ঞান ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া জাতির মুক্তি নেই,—একথাই তিনি সেদিন শোনালেন জাতির কর্ণকুহরে। মানুষ যেখানে অন্ধ ও অচেতন, সেখানে সে দুর্বল। জ্ঞান দেয় তাকে শক্তি আর শক্তিই যখন সংঘবদ্ধ হয়ে বৃহৎ কল্যাণের পথে নিয়োজিত হয়, তখন সে করে নতুন জীবনসৃষ্টি। জীবনের পদে-পদে যে-দারুণ ব্যর্থতা ও বেদনার গ্লানি, বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে এতবড় একটা বিরাট জাতির অস্তিত্ব যে আজ দুর্বিসহ, তার সবচেয়ে বড় কারণ আমাদেরই অজ্ঞতা, অন্ধতা ও স্বেচ্ছাচার-স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা।

•

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল্য নিশ্চয়ই জীবনে রয়েছে, তবে সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের সংগে থাকা চাই জনকল্যাণের আদর্শ। একমাত্র এই সমন্বয়ের পথেই গড়ে উঠ্‌তে পারে সজ্ঞান সঙ্ঘবদ্ধতা যা হলো সকল প্রগতিমূলক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় উপাদান। ভারতবর্ষ তখন (১৯০৬) সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে নিদারুণরূপে। মনুষ্যত্বের অবমাননা, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা হয়ে পড়েছে তার নিত্য সহচর। এই আহত মনুষ্যত্ববোধের গর্বিত বেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে এই মহাজাতির রাষ্ট্রিক আন্দোলন। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলভার ভেঙে ফেলা এর উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য একাকীত্বের নির্জন সাধনায় সফল হবার নয়। সে-জন্য প্রয়োজন বিরাটের কাছে ক্ষুদ্রের, বহুর কাছে আপনাকে উৎসর্গ করার সজাগ চেতনা। স্বামী অভেদানন্দ'র কণ্ঠ থেকে সেদিন তাই বারবার উচ্চারিত হলো স্বার্থত্যাগ ও সমবেত সাধনার মন্ত্র। তিনি বললেন, আদর্শের চরণতলে আত্মবলিদান ছাড়া নতুন জীবনসৃষ্টি

অসম্ভব। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ব্যতীত বিরাট জাতির সাম্রাজ্যবাদী রথচক্র থেকে মুক্তি চিন্তার বিলাসমাত্র (৩)।

চাই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংস্কৃতির লেনদেন

বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলভার ভেঙে ফেলার আহ্বান অভেদানন্দের কণ্ঠ থেকে সে যুগে নিঃসৃত হলেও, অন্ধভাবে বিদেশী নামে চিহ্নিত সকল বস্তুকেই বর্জন করতে বলেন নি। এখানে তাঁর দূরদৃষ্টির সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশী ভাব, বিদেশী চিন্ত-সম্পদ, বিদেশী সাধনার ধারার সবটুকুই নিন্দনীয় নয়। অবশ্য বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ সর্বদাই মারাত্মক। অনুকরণ কখনও জীবনসৃষ্টির পথে সহায়ক নয়। তা আত্মবিকাশের চেয়ে আত্মবিনাশেরই কারণ হয়ে থাকে বেশী। মনীষী ওস্কার ওয়াইল্ড্ অনেকদিন আগে তাঁর "দি সোল্ অব ম্যান্ আন্ডার সোস্যালিজম্" গ্রন্থে লিখেছেন; "অল্ ইমিটেশান্ ইন্ মর‍্যাল্‌স্ অ্যাণ্ড ইন্ লাইফ্ ইজ্ র·"—অর্থাৎ কি আদর্শে, কি জীবনের আচরণে অনুকরণমাত্রই ভ্রমাত্মক। স্বামী অভেদানন্দরও সুস্পষ্ট অভিমত হলো এই। স্বদেশী যুগে যখন বিদেশী-বিরুদ্ধ আন্দোলন চলেছে দেশের দিগন্ত-জোড়া, তখনও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার মত তিনি যুবসম্প্রদায়কে বলেছিলেন, বিদেশীর সব কিছুই যেন আমরা অন্ধভাবে বর্জন না করে ফেলি। তা হবে গোঁড়ামি ও মানসিক সংকীর্ণতারই নামান্তর। জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমান্বিত ও সুন্দর ঐশ্বর্যগুলিকে সযত্নে রক্ষা করতে তো হবেই, কিন্তু তারজন্য পুরাপুরি বিজাতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন অনুচিত।

(৩) অভেদানন্দ'র "লেকচারস্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৯০৬", পৃষ্ঠা ২০৪, ৩২১

কোনো জাতিই নিছক নিজের শক্তি ও সাধনার জোরে বাঁচে না। সাংস্কৃতিক বিনিময় ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যেমন ঘটছে, তেমনি জাতিতে-জাতিতেও ঘটে থাকে অহর্নিশ।

সুস্থ ও সচল জীবনের চিহ্ন হলো নতুনকে গ্রহণ করেও আপন স্বাতন্ত্র্যটুকু অক্ষুণ্ন রাখা। বিদেশকেও আমাদের নতুন নতুন তত্ত্ব ও বিস্তার সন্ধান দিতে হবে, বিদেশ থেকেও আমাদের তদনুরূপ ঐশ্বর্য আহরণ করতে হবে। তবে ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি নিয়ে অন্ধভাবে অপরের ভাব, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণের প্রয়াস ব্যর্থ। আমাদের জাতির বৃহত্তর জীবন-বিকাশের জন্য বিদেশকে আমাদের দিতেও হবে, বিদেশ থেকে আমাদের বিচক্ষণভাবে গ্রহণও করতে হবে। যে তামসিকতা, জড়ত্ব ও অন্ধ বিদেশী-বিদ্বেষ জাতির জীবনকে মলিন করে তুলেছে, তার থেকে মুক্তি চাই। ভারতবর্ষকে আজ বৃহৎ জগতের আলোড়ন ও গতির সংস্পর্শে আসতে হবে এবং সেই আলোকে গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্য ভারতবর্ষের জ্যোতির্ময় মূর্তি। এ ভারতবর্ষ হবে শক্তিযোগী। এ ভারতবর্ষ হবে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক্। এই ছিল স্বদেশীযুগে (১৯০৫-০৬) জাতির কানে অভেদানন্দ'র অন্যতম প্রধান বাণী।

আর্থিক স্বাদেশিকতা

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দিকেও অভেদানন্দ'র ছিল সজাগ দৃষ্টি। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই জাতীয় মুক্তির একমাত্র বা শেষ কথা নয়। আর্থিক উন্নয়ন ছাড়া রাষ্ট্রিক স্বাধীনও ব্যর্থ। বিদেশীর দিকে আর্থিক বিষয়ে একান্তভাবে নির্ভরশীল না হয়ে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে হবে জাতীয় শিল্পের সমৃদ্ধি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগে এই আর্থিক স্বাদেশিকতা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর্থিক স্বাদেশিকতার অর্থ গোঁড়ামি নয়,

কূপমণ্ডুকতা নয়, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা মাত্র। তাই অভেদানন্দ বংগ-বিপ্লবের যুগে জাতির কাছে আর্থিক স্বাদেশিকতার মন্ত্র জোরের সংগে প্রচার করেছিলেন। বার বার তিনি বলেছিলেন, আমাদের বন্ধ করতেই হবে বিদেশীর ভারতীয় সম্পদশোষণ (৪)। এ পলাতক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর চিন্তা নয়—বাস্তববাদী ও সজাগবুদ্ধি স্বদেশ-সেবকের অগ্নিমন্ত্র।

অস্পৃশ্যতা-বর্জন

১৯০৬ সালের অভেদানন্দ সমাজ-চিন্তায়ও ছিলেন বিপ্লববাদের সমর্থক। স্বদেশী সমাজের নানা গলদ ও অসম্পূর্ণতাও সেই স্বদেশীযুগে অভেদানন্দর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত যে হরিজন-আন্দোলন, তার মানসিক পটভূমি, অনেকখানিই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ। "উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দের "হিন্দুইজম্ য্যাণ্ড আনটাচেবিলিটি" গ্রন্থে (কলিকাতা ১৯৪৬, পৃঃ ৪৭-৪৮) এ বিষয়ে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। ঘটনাবলীর দিকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখ্‌লে সহজেই বুঝা যায় যে, বিবেকানন্দের "দরিদ্র-নারায়ণ তত্ত্ব" গান্ধীজীর "হরিজনতত্ত্বে"র দার্শনিক বনিয়াদ। এই বনিয়াদ-রচনার কাজে অভেদানন্দ'র কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাইরের পরিচয়ে ও প্রতিষ্ঠায় মানুষে মানুষে যত পার্থক্যই থাকুক্, সকলেই হলো একই বিশ্বপ্রাণের প্রকাশ, সকলের মধ্যেই তরঙ্গায়িত এক অসীম প্রাণের স্পন্দন,—বেদান্তের এই মৃত্যুঞ্জয়ী সত্য

(৪) অভেদানন্দ'র "লেক্‌চার্স্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৯০৬" পৃষ্ঠা, ১০৬—০৭, ১১৮, ২০৪, ২৪৫, ৩৩৯, ৩৪২

অভেদানন্দ সেযুগে বারবার জাতির দৃষ্টির সাম্‌নে তুলে ধরেছিলেন। চারিপাশের অগণিত মানুষকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও উপেক্ষিত করে রেখে আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকেই শুধু অস্বীকার করিনি, আমরা নিজেদের ক্ষতিও করেছি সুবিস্তর। জনতার এক বিরাট অংশকে দুর্বল করে রেখে আমরা কি নিজেদেরই দুর্বল করে ফেলে নি? এ প্রশ্ন অভেদানন্দ স্বদেশীযুগে স্বদেশীসমাজকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বারবার তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের মনুষ্যত্বের দাবীই সজোরে ঘোষণা করেন সকলের সাম্‌নে। এদের সহজ ও সত্যকার দাবিগুলিকে অস্বীকার করেই সুরু হয়েছে জাতির জীবনে দুর্ভাগ্যের অমানিশা। তাই অভেদানন্দ স্বদেশীযুগে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জাতির চেতনাকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে বারবার আবেদন জানিয়েছেন—সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে চেষ্টা করেছেন অস্পৃশ্যতার সর্বনেশে ও আত্মঘাতী পথ থেকে জাতির মনকে মুক্ত করতে (৫)। যারা অনাদৃত, উপেক্ষিত ও দৈন্যক্লিষ্ট তাদের দিতে হবে বাঁচবার মতো অধিকার—তাদের নয়নে দিতে হবে জ্ঞানের আলো। তারা অন্ধ ও অচেতন; তাই তারা দুর্বল। তাদের দিতে হবে জ্ঞানের সন্ধান; জ্ঞান দেবে তাদের অফুরন্ত শক্তি।

হিন্দুনারীর স্বাধিকার

ভারতীর নারীদের শোচনীয় অবস্থাও স্বদেশীযুগে অভেদানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বৈদিক যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় মেয়েরা পেয়েছিল সমাজ-জীবনে অনেক

---

(৫) অভেদানন্দ'র লেক্‌চারস্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৯০৬, পৃষ্ঠা, ৩৩৯, ৩৫৩-৫৫, ৩৫৮ দ্রষ্টব্য

বেশী মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা (৬)। তখন তারা তুলনায় অনেক বেশী শিক্ষা পেতো, অধিকার পেতো, জীবনের নানা বিভাগে আপনাকে প্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে পরবর্তীযুগে মেয়েদের ঘটলো সমাজ-জীবনে অধিকারচ্যুতি, আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হারানোর পরিণামে মেয়েরা হয়ে পড়লো অনেক ক্ষেত্রেই ক্রীতদাসী। শাস্ত্র ও ধর্মের মারফৎ সেই দাসত্বকে করা হলো আরও সুদৃঢ় (৭)। বিংশশতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় নারীদের যে সামাজিক পরিণতি, তা ছিল যেমন শোচনীয় তেমনি দুর্বিসহ। হৃদয়বান সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে এ সত্য অতি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। অতীতের ইতিহাস যাদের একদিন দিয়েছিল মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা আধুনিক সমাজ করেছে তাদের মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চনা। অতীতের গৌরবময় স্ত্রী-স্বাধীনতার মহিমা-কীর্তন করতে গিয়ে অভেদানন্দ বর্তমান সমাজের শোচনীয় পরিণতিকে কখনই উপেক্ষা করতে পারেন নি। মেয়েরাও সকলের আগে মানুষ। মানুষের যা অধিকার, তা মেয়েদের নিকটও করতে হবে প্রসারিত। গুণ, শক্তি ও অবস্থা অনুযায়ী কর্ম-বিভাগ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলে মেয়েদের সমাজ-জীবনের সহজ ও সত্যকার অধিকারগুলিকে অস্বীকার করার কোনো অর্থই হয় না।

(৬) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি" (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৭০) দ্রষ্টব্য। এই প্রসংগে উমা সেন রচিত "প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান" (বিশ্ববাণী, পূজাসংখ্যা, ১৩৫৪) পঠিতব্য। প্রবন্ধটিতে সুত্রাকারে ভারতীয় সমাজে নারীর অধিকার-বিবর্তন আলোচিত হয়েছে।

(৭) ডাঃ আল্‌তেকার প্রণীত "দি পজিশান্ অব উইমেন্ ইন্ হিন্দু সিভিলিজেশন্", পৃষ্ঠা ৪১৫-৩২ দ্রষ্টব্য।

মেয়েদের অধিকারকে অস্বীকার করে সমাজ আপনারই ক্ষতি করেছে। অতীতের কৃত পাপ ও ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ করবার দিন এসেছে। মেয়েদের দিতে হবে সুশিক্ষা ও আত্মবিকাশের অবোধ সুযোগ। পুরুষদের মতো মেয়েদেরও দিতে হবে পুর্নবিবাহের সহজ স্বীকৃতি (৮)।

জাতিভেদহীন হিন্দুত্ব

আজকের দিনে এসকল চিন্তাধারা অত্যন্ত সুপরিচিত, এতই সুপরিচিত যে অনেকের বিচারেই হয়তো সেগুলি নরমপন্থী মতবাদমাত্র। কিন্তু নরমপন্থী ও চরমপন্থী শব্দগুলি একান্ত ভাবেই আপেক্ষিক। সময় ও স্থানের আষ্টেনীতে তাদের অর্থ সীমাবদ্ধ। আজকের দিনে যা বিপ্লবাত্মক বলে চিহ্নিত, আগামী কালের ভবিষ্য যাত্রীদের কাছে তাই হয়তো বিবেচিত হবে উন্নতি-বিরোধী বা রক্ষণশীল। তেমনি আজকের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যে মনোভাব অত্যন্ত নরমপন্থী বা অবৈপ্লবিক প্রতীয়মান, ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক স্তরে হয়তো তাই ছিল চরমপন্থী বা বৈপ্লবিক। প্রগতি, উন্নতি বা বিপ্লবের এই আপেক্ষিক গতিতে সুস্পষ্ট ধারণা যাদের আছে, তারা নিশ্চয়ই স্বদেশী যুগের অভেদানন্দকে বিপ্লবাত্মক চিন্তাবীর বলেই স্বীকার করতে বাধ্য। 'জাতির্ভেদহীন হিন্দুত্বে'র (কাস্‌ট্‌লেস্‌ হিন্দুইজমের) আদর্শ আজকের দিনেও অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকে, অথচ প্রায় চল্লিশ বছর পূর্ব্বে অভেদানন্দ বৈদিক ধর্মের একনিষ্ঠ প্রতিভূ হয়েও জাতিভেদহীন হিন্দুত্বের স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। জাতিভেদপ্রথার মতো সর্ব্বনেশে বস্তু আমাদের সমাজে অতি বিরল।

(৮) অভেদানন্দ'র "লেক্‌চারস্‌ অ্যাণ্ড আাড্রেসেস্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া, ১৯০৬, পৃষ্ঠা ১০২-০৬, ৩৩৯-৪০, ৩৪২, ৩৬০, ৩৬২ দ্রষ্টব্য।

বিরাট জাতিকে অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এযুগে খণ্ড-বিখণ্ড করে রাখার মতো ক্ষতির কারণ আর নেই,—এ সত্যটুকু অত্যন্ত সহজ-দৃষ্টিতেই অভেদানন্দ দেখ্‌তে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সমাজকে 'জাতিভেদহীন হিন্দুত্বে'র আদর্শে পুনর্গঠিত করা। যুগযুগান্ত-ধরে চলে-আসা যে সুপ্রচলিত সামাজিক কাঠামো, তার মূলে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন এভাবে কুঠারাঘাত করেছিল বলেই জাতির ইতিহাসে এ আন্দোলন বিপ্লবাত্মক বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে (৯)। যাঁদের আশ্রয় করে এ আন্দোলন প্রসারিত ও প্রচারিত হয়েছিল, অভেদানন্দ তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন বরেণ্য অধিনায়ক। বৃহত্তর ভারতের অন্যতম প্রতিষ্ঠারূপে অভেদানন্দকে বিস্মৃত হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি 'জাতিভেদহীন হিন্দুত্বে'র অন্যতম বিরাট আদর্শপ্রচারক হিসাবেও তাঁকে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব।

---

(৯) সুবিখ্যাত লেখক অমিত সেন "নোটস্ অন্ দি বেংগল রেণেসাস" (বম্বে, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৪১, ৫২) পুস্তকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তা ও আদর্শকে প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত করেছেন। সমাজ ও সময়ের আবেষ্টনীতে সজাগ দৃষ্টি রেখে এই মতটি স্বীকার্য বলে মনে হয় না। হিন্দু সামাজিক গড়নের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিষ্ঠান হলো বর্ণাশ্রমপ্রথা। বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে সমাজের পুনর্গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শন প্রচার করেছিল "জাতিভেদহীন হিন্দুত্বের" আদর্শ। "জাতিভেদহীন হিন্দুত্বের" আদর্শ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও হিন্দু সমাজের অধিকাংশ নরনারীর দৃষ্টিতে বিপ্লবাত্মক বিবেচিত হয়ে থাকে। সামাজিক স্বীকৃতির কমবেশীর উপর কোন দর্শনের বিপ্লবাত্মক রূপ সকলক্ষেত্রে নির্ভরশীল নয়। তাছাড়া, সে যুগের ব্রাহ্মদর্শনের উগ্র সামাজিক মতবাদ হয়তো রামকৃষ্ণদর্শনে ছিল না, কিন্তু তাই বলেই কী রামকৃষ্ণ-দর্শনকে "প্রাচীনপন্থী" বিশেষণে চিহ্নিত করা কোনো যুক্তি?

সমসাময়িক ভারতের চোখে অভেদানন্দ

(১৯৪১—৪২)

১। বিনয় সরকারের বৈঠকে

অভেদানন্দ'র রচনাবলী (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)

প্রশ্নকর্তা—আপনি অভেদানন্দ'র "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পীপ্‌ল্" (নিউইয়র্ক, ১৯০৬) বইটা সম্বন্ধে কী মনে করেন ?

সরকার—বইটা আমি প্রথম পড়ি আমেরিকায় (১৯১৪—২০)। পছন্দ করেছিলাম। অনেককে পড়্‌তে বলেছি। আজকালও পছন্দ করি। প্রথম অধ্যায়ে আছে ভারতীয় দর্শন সমন্ধে বিবরণ। অতি সংক্ষেপে সকল্ কথা বেশ বলা আছে। ঐ সম্বন্ধে সেকালে ইংরেজিতে কয়েকখানা বই পাওয়া যেত। সে সবের সংগে গ্রন্থকারের পরিচয় দেখ্‌তে পাই। বৃত্তান্তটা সরস আর সুবোধ্য,—আজও স্বীকার-যোগ্য। তবে সন-তারিখের কথা আলাদা। অন্যান্য প্রবন্ধে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক ইত্যাদি বিষয় বিবৃত আছে। একাল ও সেকাল দুই-ই পাক্‌ড়াও কর্‌তে পারি। বিনা-প্রমাণে অভেদানন্দ কোনো কথা বলেন না। মেজাজটা তাঁর তথ্যনিষ্ঠ ও সংখ্যানিষ্ঠ। বই পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর বেশ। পাদটীকাগুলা তার সাক্ষী। রমেশদত্ত ইত্যাদি গবেষকদের রচনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য অভেদানন্দের দরদ ছিল সুস্পষ্ট। ইংরেজী রচনা-কৌশল তারিফ্‌যোগ্য।

প্রশ্নকর্তা—অভেদানন্দ'র "লেকচার্‌স্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৯০৬" বইটা আপনার কেমন লেগেছে ?

সরকার—বিবেকানন্দ-বিষয়ক "কলম্বো হতে আলমোড়া" ("ভারতে বিবেকানন্দ") বইটা যা, অভেদানন্দ-বিষয়ক এই ইংরেজী বইটা বিলকুল তাই। দুটোই আমার কাছে সমান মূল্যবান্।

কলম্বোয় নামা হতে অভেদানন্দ দেশবাসীর পূজা খেতে আরম্ভ করেন। পূজা খাওয়া শেষ হয় মাদ্রাজ-কলিকাতা হয়ে বোম্বাইয়ে ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত পাঁচ-ছয় মাসে। বোধ হয় শ'দেড়েক সম্বর্ধনা জুটেছিল। এই সম্বর্ধনাগুলা আমার খুব ভাল লেগেছে। তাই দিয়ে আমি তামাম্ ভারতের মুড়োটা নিজ মুঠার ভেতর খানিকটা পাকড়াও করতে পেরেছি। তখন চলছিল গৌরবময় বঙ্গবিপ্লব আর ভারত-জোড়া স্বদেশী-আন্দোলন। ভারত সন্তান শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে—হাজারে অভেদানন্দকে মাথায় করে নাচানাচি করছিল। এই নাচানাচির ভেতর দেখতে পাচ্ছি মাত্র এক ঢাক, আর শুনছি কেবল এক সুর। ঢাক বাজ্ছিল,—ভারতবাসীর আমেরিকা-বিজয়। এই হোল অভেদা-পূজার একমাত্র মুদ্দা। বইটার ভেতর বৃত্তান্তগুলো নয়া ভারতের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস খুলে ধরেছে। বিবেকানন্দ-বিষয়ক বইটারও সামাজিক মূল্য এইরূপ।

অভেদানন্দকে নিয়ে মাতামতি কর্তে কর্তে সমগ্র ভারত এক হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় ঐক্য অভেদানন্দ সম্বর্ধনার ভেতর দিয়ে মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল। সে এক অভিনব দৃশ্য।

একদিকে দেখ্ছি ভারতের অলিতে-গলিতে দিগ্বিজয়ের আদর্শ আর একদিকে দেখছি ঐক্যবদ্ধ ভারতের ছবি। এই দুই জিনিষের সাক্ষীস্বরূপ বইটা অনেকদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় নরনারীর নিকট মূল্যবান থাকবে।

একটা তৃতীয় কারণও আছে। জানিস্-ইতো আমি বংগ-চন্দ্র,—

বাঙালীর বাঙালী। বাঙালীর চোখে ভারতের সর্বত্র অভেদানন্দ-পূজাটা দেখ্‌ছি। আর মনে হচ্ছে বইটার ভেতর পাচ্ছি সর্বত্রই বাঙালীর দিগ্বিজয়। আমার বিশ্বাস,—ভরতে বিবেকানন্দ-সম্বর্ধনার সময়ই (১৮৯৭—৯৮) বাঙালীর সর্বপ্রথম দিগ্বিজয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্নকর্তা—এই বইএর ভেতরকার অভেদানন্দ-দর্শন কিরূপ মনে করেন ?

সরকার—সম্বর্ধনার জবাবে অভেদানন্দ বেদান্ত ও হিন্দুত্বের কথা বলেছেন। আমেরিকায় বিবেকানন্দ'র দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ায় বেদান্ত-প্রচারের বর্তমান অবস্থা বিবৃত হয়েছে। ভারতীয় নরনারীর জন্য কয়েকটি পাঁতিও প্রচারিত হয়েছে। তার ভেতর প্রধান কথা,—শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের চর্চা। আর একটা বড় কথা, ভারতীয় ঐক্য। দলগঠন, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি দফাও জোরের সহিতই বলা আছে। অধিকন্তু, মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখবার বিষয়েও জোর দেওয়া আছে। কাজের কথা সবই।

প্রশ্নকর্তা—বইটা দেশে সুপরিচিত নয় কেন বলতে পারেন ?

সরকার—বোধহয় ঐ বইটাতে অভেদানন্দের রাষ্ট্রিক সুর কিছু নরম। পাঁচ-সাত জায়গায় রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে দ্বিতীয় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে,—এমনকি বেশ-একটু নকড়া-ছকড়া করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপর জোর পড়েছে অত্যধিক। ডোজটা চরম। তাতে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বেচারা চাপা পড়ে গেছে। হয় তো এই কারণে স্বদেশী-যুগের যুবক-ভারত বইটা পছন্দ করে নি। আর আজও হয় তো এই কারণে বইটা "জাতে উঠ্‌তে" পারে নি।

কিন্তু অভেদানন্দ-দর্শনে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার ঝাঁজ বেশ কড়া। "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পীপ্‌ল্‌" বইটার কথা আগেই বলেছি। কাজেই

"লেকচার্‌স্‌ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্‌" বইটা বয়কট করা উচিত নয়। তা' ছাড়া, আগেই বলেছি,—অন্যান্য কারণেও এর কিম্মৎ খুব বেশী।

প্রশ্নকর্তা—অভেদানন্দ'র "রি-ইনকারনেশন" (পুনর্জন্ম, ১৯০০) "স্পিরিচুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট" (আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ, ১৯০২), "ফিলজফি অব ওয়ার্ক" (কর্ম-দর্শন, ১৯০৩), "পাথ্‌ অব্‌ রিয়েলিজেশন" (সাধনার পথ, ১৯৩৯) ইত্যাদি পুস্তকাগুলা আপনার কেমন লাগে?

সরকার—অভেদানন্দ'র রচনাবলীর একটা মস্ত বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি। কোনো কথা একমাত্র ভারতীয় মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রায় সকল লেখাতেই এক সংগে হিন্দু ও অহিন্দু, ভারতীয় ও অ-ভারতীয় তথ্যের সমাবেশ দেখ্‌তে পাই। এই তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী আমার অতি-প্রিয়। তবে তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর সদ্ব্যবহার করা অনেক সময় ঘটে উঠে না। প্রয়োগ করা কঠিনও বটে। তার কারণ আমি "ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা, শিকাগো ১৯১৮) প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছি।

দ্বিতীয় কথা,—প্রাচীন বাণী ব্যাখ্যা করবার জন্য অভেদানন্দ আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহচর্য নিতে অভ্যস্ত। ফলতঃ বেদান্তই বল, হিন্দুত্বই বল, যোগই বল,—সবই পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে।

লিখবার প্রণালীতে গ্রন্থকারের অস্পষ্টতা নেই। সব কথা সোজা-ভাবে বোঝানো আছে। যে-কোনো লোক সবই বুঝতে পারে। বুঝাবার ভেতর নকল-নবিশি কিংবা দু'মনা ভাব নেই। সব-কিছু সজোরে বলবার ক্ষমতা দেখতে পাই। রচনাগুলা আন্তরিকতাময়। ঠিক যেন শ্রোতা বা পাঠককে দখল করার লক্ষ্য রেখে কথাগুলা বলা

হচ্ছে। এই ধারণা মনে আসে। অভেদানন্দ’র ইংরেজী সরল, সরস ও সতেজ। গ্রন্থকার বাঙালী বলে আমি নিজেকে গৌরবন্বিত মনে করি।

বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ সম্বন্ধে গবেষণা
(২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)

প্রশ্নকর্তা—অভেদানন্দ’র এ পুস্তিকাগুলা একালে্ও কার্যোপযোগী হতে পারে কি ?

সরকার—পুস্তিকাগুলা বিবেকানন্দের পুস্তিকাগুলার মতনই ধর্মের বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম-ঘেঁষা দর্শনের আর দর্শন-ঘেঁষা ধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা অনেক দিন পর্যন্ত দেশবিদেশে কাজে লাগবে। বাঙালী আর অ-বাঙালী অন্যান্য ভারত-সন্তানদের পক্ষেও,—জীবন যাত্রার জন্য আর আর কর্তব্য পালনের জন্য,—ব্যাখ্যাগুলা যারপরনাই দামী।

বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ ইংরেজীতে যে-সব ধর্ম-কথা ও দার্শনিক বাণী ব্যাখ্যা করে গেছেন, সে-সবের ভিত্তি বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতায় আর রামকৃষ্ণ-কথামৃতে। কিন্তু এই ধরণের ধর্ম-প্রচার আর দর্শন-ব্যাখ্যা দুনিয়ার সাহিত্যে বড়-বেশী নেই। খৃষ্টিয়ান দার্শনিক ও ধর্মগুরুদের বইগুলার সংগে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ’র ব্যাখ্যাগুলা তুলনা করে দেখা যেতে পারে। বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ’র ধর্ম-ঘেঁষা দার্শনিক ব্যাখ্যাগুলাকে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বিবেচনা করি। তবে ভারতের নয়া-পুরানা টুলো পণ্ডিতেরা আর প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিক-সারসংগ্রাহকেরা বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ’র রচনাবলীর আসল কিম্মৎ পাকড়াও করতে পারবে কিনা জানি না। এই সকল পণ্ডিত-গবেষক ঐতিহাসিকেরা অতিমাত্রায় দাম্ভিক।

আর এক কথা। হিন্দুত্ব সম্বন্ধে নানাযুগে নানা ভারতবাসী নানা মত প্রচার করেছেন। প্রশ্ন করছি,—এই সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় মনীষীদের চিন্তা কিরূপ ছিল? জবাব দিচ্ছি,—তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ কর্তৃক প্রচারিত মার্কিন প্রবন্ধগুলা।

প্রশ্নকর্তা—অভেদানন্দ'র গ্রন্থাবলী অথবা বিবেকানন্দ'র গ্রন্থাবলী হতে একালের যুবক ভারত কি কোনো প্রেরণা পেতে পারে?

সরকার—যুবক ভারত ক্রমেই স্বাধীনতা-নিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছে। দিগ্‌বিজয়ের সোআদও তার জীবনে কিছু-কিছু করে জুটছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি দিন-দিন বেশ-কিছু বেড়ে চলেছে। একালের ভারতীয় আবহাওয়ায় দিগ্‌বিজয় আর বৃহত্তর ভারত খুব বড় জিনিষ।

কাজেই যুবক ভারতের পক্ষে দিগ্‌বিজয়ের প্রবর্তক বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ রোজ-রোজ নতুন-নতুন মূর্তিতে দেখা দিতে বাধ্য। এই দুই বৃহত্তর ভারত-প্রতিষ্ঠাতার জীবন কাহিনী একালের ভারতীয় নরনারীর চোখে যারপরনাই মূল্যবান বিবেচিত হবে। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গবেষণা, আর অভেদানন্দ সমন্ধে গবেষণা আগামী ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভেতর ভারতীয় সমাজ-শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান গবেষণায় পরিণত হবে। ১৮৯৩ হতে ১৯০২ পর্যন্ত বিবেকানন্দ'র প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক ঘটনা খুঁটিনাটির সহিত আলোচিত হবে। সেই সংগেই সমান আগ্রহের সহিত আলোচিত হবে অভেদানন্দ'র ১৮৯৬ পর্যন্ত বিদেশ-প্রবাসের দশ বৎসর। অভেদানন্দ'র রচনাগুলা সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে পাওয়া যায়।

দার্শনিকদের চিন্তায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাযুগটা (১৮৯৩—

১৯০২) অনেক-কিছু খোরাক জোগাবে। আর ঐতিহাসিকদের চিন্তায় এই যুগের চেয়ে কোনো যুগই গবেষণার জন্য মহত্তর বিবেচিত হবে না। বিংশ-শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী আর অভেদানন্দ-গ্রন্থাবলী দর্শন-সেবক আর ইতিহাস-সেবকদের বেদ-বাইবেল কোরাণে পরিণত হবে।

একালে পাশ্চাত্য জগতে কাণ্ট-গবেষণা, হেগেল-গবেষণা ও মার্ক্স্-গবেষণা পণ্ডিত-সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। লেনিন-গবেষণাও সেই ধাপে উঠ্ছে। অনতিদূর ভবিষ্যতে বিবেকানন্দ-গবেগণা আর অভেদানন্দ-গবেষণাও ভারতীয় সুধী-সমাজে সেই কোঠে গিয়ে উঠ্বে।

বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ'র দার্শনিকতা

(৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪২)

প্রশ্নকর্তা—বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ প্রণীত বেদান্তবিষয়ক রচনা-বলীর দার্শনিকতা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

সরকার—আগেই বলেছি, প্রত্যেক লেখকের রচনা নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। এক-এক রচনার এক-এক সোআদ। যে-যে রচনায় বা বক্তৃতায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বেদান্ত, যোগ, গীতা, উপনিষদ্ ইত্যাদি সাহিত্যের তর্জমাকারী, ভাষ্যকার, সার-প্রচারক ও ব্যাখ্যা-কার,—সেই সকল রচনায় বা বক্তৃতায়, বলা বাহুল্য, এঁরা দার্শনিক নন। এঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন বা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারক মাত্র। প্রসংগক্রমে বলে রাখছি যে, এঁদের অনেক বক্তৃতায়, বেদান্ত ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্যের নাম দেখা যায় না। কিন্তু ভিতরে প্রচারিত মতগুলা সবই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি হতে গৃহীত। সিদ্ধান্তগুলা প্রাচীন।

এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত প্রচারের কাজকেই এঁরা স্বধর্ম্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকে দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ও লক্ষ্য। কাজেই নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা দার্শনিক কি না এই প্রশ্নটা অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক।

প্রশ্নকর্তা—প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্তের প্রচারকদেরকে আপনি দার্শনিক বলছেন কেন? আপনার মতে তো এঁরা দার্শনিক শ্রেণীর লেখক নন?

সরকার—তথাপি এঁদেরকে আমি পাকা দার্শনিক বিবেচনা করে থাকি। বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ তর্জমা ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বইও লিখেছেন। সেই সব রচনায় আছে লোকজনকে কর্তব্য শেখানো। প্রথমতঃ দেশবিদেশের নরনারীকে আত্মোন্নতির উপায় বাৎলানো আছে। দ্বিতীয়তঃ, কোনো-কোনো লেখায় হদিশ আছে দেশোন্নতির। এই হদিশগুলা ভারত-সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট। কর্তব্য-প্রচার আমার বিচারে দর্শনের অন্তর্গত।

প্রশ্নকর্তা—বিদেশকে উপদেশ-দেবার চিহ্ন আপনি বিবেকানন্দ-সাহিত্যে আর অভেদানন্দ-সাহিত্যে বেশী পান কি?

সরকার—জবর পরিমাণেই পাই। বিবেকানন্দ'র বকাবকির ফলে পাশ্চাত্য দুনিয়া বেদান্তের দিকে, ভারতের দিকে, ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুকৃতে উৎাসহী হয়েছিল। উৎসাহটা গজিয়ে তোলা সহজ ছিল না। এজন্য অনেক কাঠখড়ের দরকার হয়েছিল। শত্রু ছিল হরেক রকমের। দুনিয়ায় বেদান্ত-প্রচার "মধুর বহিবে বায়, বেয়ে যাব রঙ্গে"—নীতিতে অগ্রসর হয় নি। যাই হোক্, সেই সকল বকাবকির ভেতর বিবেকানন্দ'র দর্শন ঢুঁড়তে হবে। আগেই দু'এক-

বার বলেছি। বকাবকি ছাড়া, শব্দের হরির লুট ছাড়া—দর্শন আর কিছুই নয়।

বিবেকানন্দী বক্তৃতাগুলার মুদ্দা হয়তো প্রধানতঃ বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা বা রামকৃষ্ণ। কিন্তু তার ফলে শ্রোতারা হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভারতপন্থী হতে থাকে। সুতরাং এই সকল বকাবকিকে একমাত্র পরকীয় মতের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বলবো না। সেই গুলাতে কিছু কিছু পাই বিবেকানন্দ'র স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, স্বাধীন পরিভাষা।

প্রশ্নকর্তা—বেদান্ত-প্রচারের ভেতর আপনি স্বাধীন দর্শন পাচ্ছেন কোথায়?

সরকার—শিকাগো-বক্তৃতার কথা আগে দু'একবার বলেছি। অন্য কথাও আছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত একমাত্র বেদান্তের ভাষ্য, যোগের ব্যাখ্যা আর গীতার তর্জমা দিয়ে সাধিত হয় নি। তার জন্য জরুরী ছিল আধুনিক ভারতীয় রক্তমাংসের মানুষ, আর সেই জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে মার্কিণ নরনারীর সজ্ঞান হাতাহাতি। আবশ্যক হয়েছিল বিবেকানন্দ'র ব্যক্তিগত কৃতিত্ব,—বিবেকানন্দ'র বর্তমান বাঙালীত্ব, লড়াই-দক্ষ বাঙালীর জীবন-বেদ। এই সম্বলটুকুই বিবেকানন্দ-দর্শন। দেখতে পাচ্ছিস্,—প্রকান্তরে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যাগুলাই মার্কিণ মুল্লুকে বিবেকানন্দ-দর্শনের ইজ্জদ পেয়েছিল। সেকেলে বেদান্তকে বর্তমান কালের বাঙালীর বাচ্চা বিবেকানন্দ'র ব্যক্তিত্ব দিয়ে গুণ কর। তা'হলে পাবি নবীনীকৃত বেদান্ত। সেইটাই বিবেকানন্দী হিন্দুত্ব। ওদেশের পণ্ডিতেরা,—জেমস্, রয়েস্ ইত্যাদি দার্শনিকগণ বিবেকানন্দী ব্যাখ্যাকে,—নবীনীকৃত বেদান্তকে,—নয়া-বাংলার হিন্দুত্বকে একালের অন্যতম দর্শনরূপে গ্রহণ করেছিল।

একমাত্র সেকেলে বেদান্ত, যোগ ইত্যাদি সাহিত্য তাঁদের পরীক্ষায় এই ইজ্জদ পেত না। একথা বিনা সন্দেহে বলা চলে।

প্রশ্নকর্তা—অভেদানন্দের বেদান্ত-প্রচারের ভেতর স্বাধীন দর্শন আছে কি?

সরকার—আছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার হয়েছিল আমেরিকায় অভেদানন্দ'র বকাবকি ও লেখালেখি। বছর নয়-দশেক তাঁকে একা বিবেকানন্দ'র ঝুঁকি ঘাড়ে বইতে হয়েছিল (১৮৯৭—১৯০৬)। অভেদানন্দর মতন ভারত-প্রচারক না পেলে বিবেকানন্দ'র সুরু-করা কাজ মার্কিণ মুলুকে কিরূপ দাঁড়াতো,—আজ বলা কঠিন। সুতরাং অভেদানন্দ'র বৈদান্তিক বকাবকি গুলাকেও একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির তর্জমা, ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ইত্যাদি রূপে বিবৃত করা ঠিক নয়। সেই সবের ভেতর অভেদানন্দ'র ব্যক্তিত্বও দেখতে পাচ্ছি। একমাত্র পরকীয় মত কপচিয়ে লোক মাতানো যায় না আর অনেকদিন ধরে লোকজনকে সংঘবদ্ধ রাখাও সম্ভব হয় না।

২। পত্রাবলী

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

(২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১):

মানুষের হৃদয়ের গভীরতার মধ্যে এমন একটি উৎস আছে যেখান হইতে বিশ্বরহস্যের মূল উৎসটী নিরন্তর ঝরণা-ধারায় মহামন্দাকিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। আমরা নিরন্তর আমাদের নানা মোহ ও ছলনার দ্বারা নিজেদের আবৃত করিয়া রাখি বলিয়া সেই

মহা-উৎসের রস হইতে বঞ্চিত হই। উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা; তাঁহারা তাঁহাদের এই অন্তরের উৎসের মধ্যে নিত্য অবগাহন করিতেন; সেইজন্য এই উৎসের স্বচ্ছন্দবেগ তাঁহাদের বাণীতে ক্ষরিত হইয়া পড়িত। তাঁহারা যে-সত্যকে পূর্ণ আলোকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহা দেশ, কাল ও সভ্যতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। ইউরোপীয় ও আমেরিকার সভ্যতার সহিত আমাদের সভ্যতার দেশগত ও কালগত, ব্যক্তিগত বা সভ্যতাগত পার্থক্য থাকিলেও, সে পার্থক্য এই মহাসত্যের জ্যোতির নিকট নিতান্তই ম্লান। সেই জন্যেই ঋষিরা বলিয়াছেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। তাঁহাদের বাণী কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নহে, সমগ্র বিশ্বের জন্য। সেই জন্যই এই উপনিষদের বাণী আমাদের পাশ্চাত্যকালের সমস্ত সংস্কৃতিকে, সমস্ত ধর্মকে অভিসংস্কৃত করিয়াছে। বৌদ্ধযুগের যে সংস্কৃতি তৎকালীন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও এই উপনিষদের বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রাচীনকালে কেবল এশিয়াখণ্ডে নহে ইউরোপের প্রান্তভূমি পর্যন্ত এই বাণী নানা আকারে নানা সাধুদের সাধনার মধ্যে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইদানীন্তনকালে যখন আমরা পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হইয়া আমাদের সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে, ইউরোপীয় জীবনযাত্রা-প্রণালীকে আমাদের আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম, তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমেরিকায় ভারতবর্ষের এই অমোঘবাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মহাগৌরবের বোধিবৃক্ষের বীজ আমেরিকাভূমিতে প্রোথিত করেন! স্বামী অভেদানন্দ আপ্রাণ সাধনার বারিসঞ্চারে এই বীজটীকে পত্রপুষ্পে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমেরিকার নানা স্থানে তাঁহার এই দেদীপ্যমান কীর্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। আজকালকার দিনে যখন রাষ্ট্রীয় সাধনার উদ্যোগে সকলেই ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যখন অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাই আমাদের কাছে সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হইতেছে, তখনও যাঁহারা এই উপনিষদের মহাসত্যের মহাবাণীকে আপন সাধনার দ্বারা বিরাট বিশ্বের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া মহামানবের মহাঐক্যের চরম উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমাদের উন্মত্ত চেষ্টাকে সৌম্য ও শান্তির দিকে আকৃষ্ট করেন, মহা-অদ্বৈতই যে মানবের মহানিলয় এই বিষয়ে আমাদের সচেতন করেন, তাঁহারই যথার্থ অন্ধকার হইতে আমাদের আলোকের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। এই সমস্ত মহাপুরুষেরাই যথার্থ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও গৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা করেন। স্বামী অভেদানন্দ এই কার্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার বিজয় পতাকা চিরউড্ডীন হইয়া জ্যোতিসঙ্কেতে ভারতবাসীদের চিরমঙ্গল ও চির-সত্যের দিকে আহ্বান করিবে।

বিশ্বভারতী চীনাভবনের পরিচালক ও অধ্যাপক— তান্ ইয়ান্ শান্

(Prof. Tan Yun Shan.

22nd Sept., 1941) :

I met the late Swamiji for the first time at the Ramkrishna Vedanta Asram at Darjeeling in 1934 when I was spending my summer vacation there. I do not know why at the very first sight of his I began to love and admire him very much. He

was so kind, so gentle, so charming and so noble. I put quite a number of questions to him. He answered them one by one so adequately and patiently just like a father explained things to his child. Later on I had the priviledge of meeting him several times and discussed many things with him such as Buddhism, Hinduism, Indian Philosophy—specially about the Yoga philosophy and practice. He did enlighten me so much that I can hardly express it in words. Two years have already elapsed since he left this world, yet the impression he gave me is still fresh and will always be fresh in my mind. O ! I am ever grateful to him !

Students who respect and worship the Swamiji should study his philosophy and follow his teaching and example. He was indeed, one of the best representatives of the Hindu Religion and Culture in modern times, of which every son and daughter of India should be proud and should never forget.

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

• (Radha Kumud Mookerji, 12th Sept. 1941) :

I whole-heartedly support the project of publishing a proper biography of Swami Abhendananda, one of Bengal's greatest spiritual characters. I had the good fortune of coming into close contact with him and of drinking in the honeyed words of wisdom that fell from his lips. To his biographer, may I tell a story he had himself narrated to me ? It

will show his masterly handling of the mass-mind. He told me of his interesting feat in winning away thousands of American men and women from their practice of eating beef by addressing them at public meetings with his irresistible logic which held them spell-bound and was unanswerable. He naively asked them two questions :

(I) "Next to mother's milk, on whose milk do you feed your babies? The audience answered: "O, it is surely the cow's milk." Then the Swami answered back : Therefore; the Hindu venerates the cow as his second mother."

(2) "Which is the living creature in the whole world whose very excreta are medicinal and wholesome to man?" The andience answered; "Surely, it is the cow whose urine and dung as disinfectants are not repellant "to man." Then the Swami clenched his argument : "Therefore, the Hindu reveres the cow as the mother divine." His speech had its immediate effect in thousands of his audience coming forward to sign the creed of reverence for the cow and the sanctity of its life. Few could equal Swamiji in his power of popular oratory combined with that of the simplest exposition of the most abstruse philosophical positions and the subtlest of spiritual truths. We must make Sri Abhedananda live with us and for us and ever teach us in his immortal writings and published works. He is immortal as a teacher.

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ (14. 8. '41.)

I met Swami Abhedananda on one or two occasions and have had some correspondence with him. I was deeply impressed by his love for Indian Culture and loyalty to the great ideals of spiritual life. His work in America was quite impressive. I had read many of his works and believe that he did a good deal to popularise ideas of Indian Culture in the West.

হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী

(গোপাল হালদারের ভূমিকা সহ)

১৬৬ পৃষ্ঠা ঃ মূল্য ২৲

অধ্যাপক বিনয় সরকার ঃ "বইয়ের মতন বই। তথ্যকে তথ্য, চিন্তাকে চিন্তা, যুক্তিকে যুক্তি—সবই আছে ঠাসা প্রচুর পরিমাণে। এত ছোট বহরে এমন শাঁসাল বই বাঙালীর হাতে বেশী বাহির হয় নাই।"

অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার ঃ "হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে এতদিন জানতাম। তিনি যে সুলেখক ও গবেষণায় সিদ্ধহস্ত সম্প্রতি তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। বাংলাদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর বইখানি শুধু যে সুখপাঠ্য হয়েছে তা নয়, বহু পরিশ্রমে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করতে পেরেছেন, ফলে তাঁর গ্রন্থটি অনেকেরই কাজে লাগ্‌বে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

চারণ-কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ঃ "বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা যেখানে দার্শনিকের সমগ্রভাবে দেখ্‌বার ক্ষমতায় সংগে যুক্ত হয়, সেখানে ফল শুভ হয়ে থাকে। হরিদাসবাবুর লেখার মধ্যে সেই মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটেছে।"

সওগাত ঃ "বিশ্লেষণ ও প্রাঞ্জলতার দিক দিয়ে তাঁর লেখার শক্তি অনস্বীকার্য।"

বংগশ্রী ঃ "লেখকের স্বতন্ত্র মতবাদ রহিয়াছে।"

প্রবাসী ঃ "নারী কেন তাহার গতানুগতিক পন্থা বদলাইতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। সাধারণ সংস্কারমূলক মামুলি সমালোচনা করিয়া সমস্যাটি এড়াইয়া গেলে ইহার সমাধান সম্ভব

নহে। লেখক বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।" (অনাথ বন্ধু দত্ত)

উদ্বোধন : "নারী আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্মীকেই আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিপ্লবী চিন্তাধারার ছাপ পুস্তকের সর্বত্র বিদ্যমান।"

দৈনিক মাতৃভূমি : "পুস্তকখানি লেখকের চিন্তাশীলতা এবং বংগ-সমাজের প্রতি তাঁহার আন্তরিক দরদের পরিচয় দিতেছে। নরনারীর অধিকার-সাম্যের দাবীকে লেখক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াস করিয়াছেন।"

Hindusthan Standard: "Much of what Mr. Mukherjee says is thought-provoking and provocative also. His readers will certainly range themselves into two hostile camps of warm advocates and bitter critics. But that is perhaps the merit of the volume which compresses within a small compass so many stimulating ideas." (Saroj Acharya)

Amrita Bazar Partrika : "The author has rummaged an extensive field to produce this work."

Dr. Benoy Chandra Sen, Prof., Calcutta University : "Here is a large mass of information collected with great care and diligence from diverse sources and subjected to a critical investigation. The book gives ample evidence not only of a close study of relevant facts but also of much hard thinking."

Hemchandra Nag, Editor of the Hindusthan Standard : "The author has an independent line of thought characterised by creative vision."

২। বিনয় সরকারের বৈঠকে

(বিংশ শতাব্দীর বংগ-সংস্কৃতি)

দ্বিতীয় সংস্করণ : দুই খণ্ডে একত্রে ১৫২০ পৃষ্ঠা : মূল্য ১২৲

আনন্দবাজার পত্রিকা : "লেখকের বাহাদুরি এই যে, বিনয়বাবুর ভাব, ভাষা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বৈঠকের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

দেশ : "বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এখন পুস্তকের আদর হওয়া উচিত।"

Indian P. E. N. (Bombay): "Mr. Mukherjee deserves to be congratulated for having brought out the ideas and ideologies of Prof. Sarkar in a convenient and readable from. The reader is struck by the originality and forcefulness of the views expressed by Prof. Sarkar" (N. Das)

Journal of Benares Hindu University: "In the form of catechism the book does not lose its importance at all as it reads like a novel."

Calcutta Municipal Gazette: "Prof. Sarkar is a sort of an image-breaker and a 'no-respecter' of men and matters. In the present book we meet with the same quality of mind when he says that there has been no philosopher in India during recent times."

Amrita Bazar Patrika: "The book may be best styled a pocket encyclopædia of Bengali culture."

Insurance World: "We hold it important on account of the thousand and one intimate personal reminiscences it recalls of many of Bengal's great men and institutions. It is a book to read and re-read".

Hindusthan Standard: "The book gives one intimate glimpses of the mental make-up and outlook of Benoy Sarkar—the thought-leader and patriot. The first thing that strikes one regarding this book is its comprehensive sweep which includes numerous topics bearing on Bengal's cultural and social evolution".

* * *

কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। হিন্দু-বিবাহের বিবর্তন মূল্য ২৲

২। মহাভারতের ক্ষত্রিয়গণ কি অনার্য? মূল্য ।০

৩। অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা মূল্য ।।০

৪। রবীন্দ্র-কাব্যে বিপরীতের বিরোধ (যন্ত্রস্থ): মূল্য ৩৲

ইন্দিরা সরকার, এম্, এ, (ফ্রেন্‌চ্) প্রণীত

১। Socio—Literary Movements in Bengali and French. Rs. 1-8-0

২। French Stories from Alphonse Daudet Rs. 4.

৩। Social Contacts of French Women in Calcutta. „ 3.

৪। French Lessons for Indian Scholars. „ 4.

* * *

উমা সেন প্রণীত

১। উন্নতি-দর্শনে ত্রিমূর্তি (স্পেংলার, সোরোকিন ও সরকার : যন্ত্রস্থ)

২। আন্তর্জাতিক ভারত (প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্বিজয়, প্রকাশিতব্য)

* * *

শিক্ষাতীর্থ কার্যালয়

৪০।১, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪